The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 1-23, ISSN 2306-3920

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যচিন্তায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার প্রেরণা অনুসন্ধান

ইউসুফ হাসান অর্ক*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলাদেশসহ পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্যচর্চাকে বিশেষায়িত রূপে বিবেচনা করা হলেও ইউরোপিয় ঔপনিবেশিক মানসিকতা তাঁকে সফল নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এখনও কুণ্ঠিত। নাটকের আঙ্গিক, প্রয়োগ ইত্যাদি বিশ্লেষণে অ্যারিস্টটল তথা দ্বন্দ্বভিত্তিক নাট্যের বদ্ধমূল ধারণা এর কারণ হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তাকে প্রাচ্যীয় নন্দনতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয় হিসেবে বক্ষ্যমাণ গবেষণার অবতারণা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বি-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্গীয় ভূ-খণ্ডে চর্চিত ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর সাধারণীকৃত প্রবণতাকে রবীন্দ্র নাট্য প্রয়োগের সমান্তরালে বিশ্লেষণ করে তদীয় নাট্যচিন্তার স্বকীয়তা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়াস পাওয়া গেছে। বিশ্লেষণে প্রমাণ করা গেছে যে প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরোপিয় নন্দনতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত থাকলেও পূর্ব বাংলার লোকজীবনের সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতির অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রণোদিত করেছিলো এমন এক নাট্যচর্চায় যা দ্বৈতাদ্বৈত উদ্ভাস নির্মাণ করে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের গীতময়তা, বর্ণনাময়তা, কৃত্যময়তা মিলে যে অভেদ-উদ্ভাসন ও আনুষ্ঠানিক নাট্যময়তা তাই রবীন্দ্রনাট্যচিন্তাকে প্রণোদিত করেছিলো। নাট্যবেত্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কর্মের দৃষ্টান্তসহ পুনর্বিশ্লেষণ দিয়ে তদীয় স্বকীয়তা ও তার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল প্রেরণাকে প্রমাণ করা গেছে বক্ষ্যমাণ গবেষণায়।]

ভূমিকা ও উদ্দেশ্য

খুব স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের মতো বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাসমূহে প্রাপ্ত অভিব্যক্তি কৌশলসমূহ সর্বতোভাবেই বাঙালির লোকসমাজে অনুসৃত প্রাত্যহিক জীবন, জীবনবোধ ও সামষ্টিক রুচির সাথে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ব-বাংলায় তাঁর বিচরণকালে বাঙালির সেই চিরায়ত পরিবেশনাগুলো প্রত্যক্ষণ করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে আমরা জানি। তা ছাড়া এ কথাও সর্বজন বিদিত যে, ঠাকুরবাড়িতে গানের আসর, যাত্রাগানসহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই। সে কারণে সাধারণভাবে বলা হয় যে, তাঁর পরিণত পর্যায়ের নাট্যচিন্তায় উক্ত ঐতিহ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর অনুরক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ থেকে শুরু করে *শারদোৎসব*, *তপতী*, *মায়ার খেলা*, *রক্তকরবী* ইত্যাদি নাটকের ভূমিকা বা কথাপুচ্ছে তিনি তাঁর নাট্যচিন্তায় এই প্রেরণার কথা স্বীকার করে গেছেন (ঠাকুর, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ: ভূমিকা, সূচনা, গ্রন্থপরিচয়)। বাংলাদেশের লোকসমাজে আবহমানকাল থেকে বয়ে আসা নানা ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা আঙ্গিকগুলোর প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লিখিত রচনা ও

---

* **ড. এ কে এম ইউসুফ হাসান :** অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়োগসমূহে অনুভূত হলেও দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ তথা এতদ্‌বিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা লভ্য নয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই উত্তরসূরি হিসেবে দেশজ নাট্যের প্রেরণায় সেলিম আল দীন অঙ্ক-দৃশ্যবিভাজনহীন বর্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিক নির্মাণ করেছিলেন বলেও মতামত লভ্য। সেলিম আল দীন পর্যায়ে এসে বাংলা নাট্য যদি স্বকীয় একটি আঙ্গিকে এসে সংহত হয়েছে বলে মনে করি তাতেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যের প্রণোদনাবিষয়ক অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। কারণ ঐতিহ্যের প্রতি লগ্নতার প্রাথমিক প্রবণতা হয়তো তাঁরই হাতে। রবীন্দ্র নাট্যচিন্তায় ঐতিহ্যলগ্নতা ও প্রেরণার দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণই বক্ষ্যমাণ গবেষণার উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাসমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাতে অনুসৃত নানা নাট্য উদ্ভাস কী করে রবীন্দ্রনাথের নাটচিন্তায় প্রেরণা যুগিয়েছিল তা অন্বেষণ করবার অভিপ্রায়ে বক্ষ্যমাণ গবেষণার অবতারণা। বলে রাখা প্রয়োজন শিরোনামে নির্দেশিত 'পরিবেশনা' অভিধাটি দিয়ে প্রবন্ধকার বাংলাদেশের লোকসমাজে ঐতিহ্যগত-ভাবে পরিবেশিত সকল অভিকরণকে (Performance) অনুধাবন করে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা অনুধাবনের উপাত্ত ও গবেষণা পদ্ধতি

উপরে সাধারণভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যবিষয়ক তদীয় চিন্তা নানা প্রবন্ধ, ভাষণ, তাঁর লিখিত নানা নাটকের ভূমিকা বা কথাপুচ্ছে উল্লেখ করেছেন। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ, *তপতী*, *মায়ারখেলা*, *রক্তকরবী*সহ আরও কিছু নাটকের ভূমিকা বা কথাপুচ্ছে, কখনোবা নাটকাদি সম্পর্কে তদীয় চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যসৃষ্টিবিষয়ক নানা চিন্তা ও ব্যাখ্যাদি লভ্য। বক্ষ্যমাণ আলোচনার নানা পর্যায়ে সেগুলো বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতায় উল্লেখ করা হবে। তবে পূর্ববর্তী গবেবষকগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে, *বাল্মিকী প্রতিভা* থেকে শুরু করে *শ্যামা* পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তার বিবর্তন চোখে পড়বার মতো। সে ক্ষেত্রে ১৯০২ সালে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ রচনা এবং ১৯০৮ সালে *শারদোৎসব* রচনা ও প্রয়োগকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যচিন্তার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় অভিনেতার অভিনয় দেখে এককালে মুগ্ধ হয়েছিলেন পরিণত পর্যায়ে সেই তিনিই তাঁর উপলব্ধির ভুল স্বীকার করেন। নাট্যচিন্তার বিবর্তনের নানা পর্যায়ে তিনি তাঁর সৃজিত নাটক বা নাট্যসমূহকে কখনো কখনো 'পালা' বলেও অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও মঞ্চপ্রয়োগে স্পষ্টতই আঙ্গিক অন্বেষণের এক তীব্র অভিপ্রায় থেকে নানা নিরীক্ষার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। নিরীক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঝোঁক যে ছিলো তা তাঁর সমস্ত শিল্পী জীবনে শিল্পের সকল শাখাতেই চোখে পড়বার মতো। শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণে, "শিশির, তোমার ওসব কাজ নয়। পেশাদার থিয়েটার অন্য লোক চালাবে। তুমি একদল সেরা ছেলেমেয়ে নেবে– একটা আলাদা স্টেজ থাকবে– সেখানে তুমি এক্সপেরিমেন্ট করবে (ঘোষ, ২০১৭: ৯৩)।" এমনই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবিরত নাট্যনিরীক্ষায় রত ছিলেন যা শান্তি নিকেতনে এসে থিতু হন বলা যায়। বিশেষত নৃত্যনাট্য পর্যায়ে এসে তিনি গীত ও নৃত্যের ভারসাম্য বিষয়ে যে নানা ধরনের নিরীক্ষণ করেছেন তাতে মনে হয় বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত নাট্যের গীতময় ঐতিহ্যের একটি আধুনিক রূপ সৃজনাভিলাষী ছিলেন তিনি। নাট্যচিন্তার পরিবর্তনের ক্রমপর্যায়িক অন্বেষণের শেষে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যনাট্য *শ্যামার* মধ্য দিয়ে এমন এক নাট্যচর্চার অবতারণা করেন যাকে কুমার রায় বলছেন, "শুধু সঙ্গীতে শুধু ভঙ্গীতে" (রায়, ১৯৮৭: ৬২)। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁর নানা পর্যায়ের নিরীক্ষাধর্মী উদ্যোগের প্রাসঙ্গিক ও দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস রইবে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাণ্ডার বিশালায়তন। তবে এর মধ্যে একই নাটক একাধিকবার নতুন নামে রচনা বা নাট্যীকরণের ভিন্নতা রয়েছে। তাই প্রতি নাটক প্রতিপাদ্য করে রচনার ক্রমানুসারে আলোচনা নয়, বরং নিরীক্ষাধর্মী নানা উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে তাঁর নাট্যচিন্তার বিশ্লেষণ করা হবে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকর্মের সাথে খুব সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন এমন কয়েকজন মানুষের ভাষ্য থেকে রবীন্দ্র নাট্য রচনা ও প্রয়োগে তদীয় নাট্যচিন্তার বিবর্তন সম্বন্ধে জানা যায়। পরিবারের সদস্য অথবা কোনো না কোনোভাবে ঠাকুর পরিবারের সাথে যুক্ত এমন কয়েকজনের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ, শ্রীমতি রানী চন্দ, ইন্দিরা দেবী, হেমন্তবালা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, মৈত্রেয়ী দেবী, প্রতিমা দেবী, সীতা দেবীসহ আরও অনেকের লিখিত স্মৃতিচারণ পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সমকালে নানা পত্র-পত্রিকা, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে তদীয় নাট্য রচনা ও প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু বিবরণ লভ্য। সেগুলোর উপর ভিত্তি করে অর্বাচীনকালে বেশ কিছু গবেষণা ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গবেষণার উপাত্ত হিসেবে তাই উপর্যুক্ত মুদ্রিত তথ্যসমূহ এবং ঐতিহ্যবাহী নাট্যের প্রেরণা অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে সমকালে মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষকৃত কিছু নাট্যমূলক পরিবেশনার পর্যবেক্ষণজাত অনুধাবন ব্যবহৃত হবে। এ পর্যায়ে 'নাট্যচিন্তা' অভিধাটির অন্তর্ভূক্ত 'নাট্য', 'নাটক', 'অভিনয়' ইত্যাদি বিবেচনায় বি-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের বৃহদ ধারণাকে বিবেচনা করা হবে। নির্দিষ্ট করে বললে রিচার্ড শেখনারের 'পারফরম্যান্স স্টাডিজ' নামক জ্ঞানকাণ্ডে অনুসৃত শিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের যুগপৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপর্যুক্ত ধারণাসমূহকে অনুধাবন করা গেল। ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাসমূহের কনটেক্সচুয়াল স্টাডিসহ মূলত কোয়ালিটেটিভ পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাসমূহের সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্য ও নন্দনতাত্ত্বিক স্বকীয়তা অনুসন্ধান

আবহমান কাল থেকে বহমান বাংলাদেশের প্রধানত প্রান্তিক অঞ্চলে চর্চিত নাট্যমূলক পরিবেশনাসমূহের মধ্যে গাজির গান, ভাসান গান, পালাগান, অষ্টক গান, কুশান গান, গম্ভীরা, আলকাপ, যাত্রা ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য হিসেবে সাধারণভাবে অভিহিত। এতদ্‌বিষয়ক নানা গবেষণাও গত তিন দশক ধরে সম্পাদিত হয়ে আসছে। প্রবন্ধকারের নানা ফিল্ডওয়ার্ক এবং উক্ত গবেষণাসমূহের সাধারণ পর্যবেক্ষণে এ কথা সহজেই বলা চলে যে, গীত-কথা-নৃত্য সহযোগে কাহিনি বিবৃতির এক বর্ণনামূলক অভিব্যক্তি এই নাট্যমূলক পরিবেশাগুলোতে প্রযুক্ত। বর্ণনার সাহায্যে কাহিনি বিবৃত হয় বলে বর্ণনার প্রতাপকে স্বীকার করে প্রবন্ধকারসহ সেলিম আল দীন, আফসার আহমদ, লুৎফর রহমান, আহমেদ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ গবেষক এই নাট্যধারাকে 'বর্ণনাত্মক নাট্য' হিসেবে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্ব তথা অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি তত্ত্বের আলোকে চর্চিত নাট্যসমূহ থেকে এই পরিবেশনাগুলোর দার্শনিক অভিপ্রায় ও সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিন্নতা নির্দেশের জন্যই বোধ করি একটি বিশেষায়িত অভিধায় এগুলোকে অভিহিত করা হয়ে আসছে। 'বর্ণনা' সত্যিকার অর্থেই সেখানে একটি স্বকীয় ও সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্য। তবে অধুনা প্রবন্ধকারের সংশয়দীপ্ত পর্যবেক্ষণ এই যে, বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনি পরিবেশিত হলেও প্রযুক্ত অভিব্যক্তি কৌশলগুলোর (কথা-গীত-নৃত্য) মধ্যে গীতের প্রতাপ অনস্বীকার্যরূপে অনুধাবন করা যায়। অনেক সমালোচক এ কথা স্বীকারও করেছেন যে, গানের মাধ্যমে কাহিনি বা গল্প শোনানো বাংলার আদি রীতি (রায়, ১৯৮৭: ২০)। কথা-গীত-নৃত্যের অদ্বৈত উদ্ভাস থাকলেও গীত সহযোগেই বর্ণনা, প্রাত্যহিক গদ্যের বর্ণনাতেও সুরময়তার উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে প্রবন্ধকারের পূর্ববর্তী গবেষণায় (অর্ক, ২০২১: ২৫-৪০)। নৃত্য ও গীত সহযোগে কাহিনি বয়ানের ঐতিহ্য আজও বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পরিবেশনায় লভ্য। প্রবন্ধকারের পূর্ববর্তী গবেষণায় এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ লভ্য (অর্ক, ২০২১: ২৫-৪০)। সর্বোপরি বেশিরভাগ পরিবেশনার নামকরণে 'গান' শব্দটি যুক্ত। অন্যদিকে 'বর্ণনাত্মক নাট্য' অভিধাটি উপর্যুক্ত ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর দার্শনিক অভিপ্রায় 'ব্যাখ্যা'কে তার শরীরে ধারণ করলেও এর প্রায়োগিক চরিত্রটি প্রকাশ করে না। 'নাট্য' যদি একটি প্রায়োগিক কলা হিসেবে বিবেচ্য হয় তবে পরিবেশনায় প্রযুক্ত অভিব্যক্তি কৌশলগুলোর মধ্যে গীতের প্রতাপকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলা ঐতিহ্যবাহী এই

পরিবেশনাগুলোকে 'কাহিনির গীতমূলক/গীতময় পরিবেশনা' হিসেবে অনুধাবন এবং তদানুসারে কোনো অভিধা ব্যবহার করা সংগত। 'বর্ণনাত্মক নাট্য' অভিধাটি নির্দিষ্ট সময়ে পাশ্চাত্যের 'থিয়েটার' ধারণাটির বিপ্রতীপে দেশজ পরিবেশনাসমূহের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল বলে মনে করা যুক্তিসংগত। কিন্তু অভিধাটির 'নাট্য' অংশটির অন্তঃস্রোতে ভিন্ন জনপদের (বাংলা অঞ্চলের বাইরে অর্থে) নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন অথচ যুক্তিহীন সমীহ শনাক্ত করা সম্ভব। জাপানের নো কিংবা কাবুকিকে জাপানিরা 'নো-থিয়েটার' বা 'নো-নাট্য' বলে অভিহিত করে না। তারা 'নো' বলেই এই পরিবেশনাকে অভিহিত করে থাকে। কারণ নো-এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই তা 'নো' হয়ে ওঠে। একইভাবে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোরও কিছু সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে এগুলো স্বকীয় এবং স্ব-স্ব নামে আঞ্চলিকভাবে অভিহিত। আপাতভাবে সেই সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্যটি গীতমূলক অভিব্যক্তিতে কাহিনি বর্ণনা। সে কারণেই পরিবেশাগুলোর নামে 'গান' শব্দটি যুক্ত। সেই বিবেচনায় উল্লিখিত পরিবেশনাসমূহের বর্ণনাময়তার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেও এর প্রায়োগিক অভিব্যক্তির চরিত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ভরতের শাস্ত্রমতে তা 'নাট্য' কিংবা পরবর্তী অলংকারবিদগণের অভিধা অনুসারে 'গেয়-রূপক' বা 'উপ-রূপক' হলো কি-না তা নয়, বরং পরিবেশনাসমূহের সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্যের আলোকে তা লোকানুগত অভিধা হলো কি-না সেটা বিবেচনাই যৌক্তিক। 'নাট্য' বা 'রূপক' না হলেই-বা ক্ষতি কী? বাংলাদেশের উপর্যুক্ত পরিবেশনাগুলোকে অবাঙালি শাস্ত্রকার ভরতের 'নাট্য' বা 'রূপক' ইত্যাদি অভিধা দিয়ে বিবেচনা করাটাও সম্ভবত বাঙালি হিসেবে আমাদের চিন্তার দৈন্য। সে কারণেই 'বর্ণনাত্মক নাট্য' অভিধাটির অন্তঃস্রোতে একটি 'অযৌক্তিক সমীহ' শনাক্ত করেন প্রবন্ধকার। বরং বলা চলে যে, স্থানীয় ও বাঙালি সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত নামে অভিহিত করা হলেই এদের বৈশিষ্ট্যের স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। তাতে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যও থাকে বৈকি। আধুনিকতার দোহাই হিসেবে আন্তর্জাতিকতার কথা স্মরণে রাখলেও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য শেষ পর্যন্ত তদীয় স্বকীয়তার গুণে পৃথিবীকে বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর করে বলেই বোধ হয়। তাই গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সাধারণ অভিধায় অভিহিত করতে হলেও তা সুচিন্তিত ও বঙ্গীয় ভূ-খণ্ডে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত অভিধা দিয়েই করা সমীচীন। 'গান', 'পাঁচালি', 'কীর্তন', 'পালা' নানা অভিধাই বাংলাদেশের লোকসমাজে প্রচলিত রয়েছে। তবে বক্ষ্যমাণ গবেষণার প্রতিপাদ্য নামকরণ বিষয়ক সমস্যার সমাধান নয় বলে এতদ্‌বিষয়ক আলোচনা আপাতত ব্যক্ত মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুধু এটুকু না বললেই নয় যে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যের জমিনে যে গীতপ্রিয়তা তাকে বোধনের মধ্যে রেখেই এ ভূ-খণ্ডের সংস্কৃতি চর্চা ও তার প্রেরণায় উদ্ভূত সৃষ্টিসমূহকে অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণভাবে লক্ষ করা যায় যে, বাংলাদেশের লোকসমাজে (প্রধানত প্রান্তিক অঞ্চলে) চর্চিত নানা পরিবেশনাতে এক বা একাধিক গায়েন নানা কৃত্যাচারসহ মূলত গীত সহযোগে একটি কাহিনির বয়ান বা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি কাহিনি অন্তর্গত চরিত্রের সাজ পোশাকের পরিবর্তে গায়েনের সাজ অথবা প্রাত্যহিক পোশাকসহ পরিবেশনাটি করে থাকেন। পরিবেশনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্যমূলক বলে লক্ষ করা যায়। আপাত অর্থে কৃত্যমূলক না হলেও পরিবেশনার গঠনের মধ্যে কৃত্যাচার ও নাট্যকৃত্যসমূহ লক্ষ করা যায়। যেমন বন্দনা, মনঃশিক্ষা, ফেরি ইত্যাদি বেশিরভাগ পরিবেশনায় প্রত্যক্ষ করা গেছে। উপরন্তু পরিবেশনাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নানা উপলক্ষ্যে হয়ে থাকে যেখানে স্থানীয় সামষ্টিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। এরকম কোনো সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে পূর্ববর্তী গবেষকদের কেউ কেউ এগুলোকে 'সিরিমোনিয়াল' বলেছেন (দীন, ১৯৯৬: ১৪)। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এগুলো পরিবেশিত হতে দেখা যায়। উৎসব, পার্বণ ইত্যাদি বাঙালির জীবনযাপনের সাথে এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যেখানে শিল্প ও জীবনের এক দ্বৈতাদ্বৈত রূপ অনুধাবন করা গেছে। উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের

আয়োজনে তাই জানা কাহিনির এমন এক ধরনের উদ্ভাসন বা সামষ্টিক উদ্‌যাপন ঘটে যেখানে সেই অনুষ্ঠানের আমেজকে গায়েনের স্বীকার করে নিতেই হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অনুধাবন করা গেছে যে, অনুষ্ঠানের আবহ গায়েনের পরিবেশনাকে প্রভাবিত করেই (মিয়া, ২০১৪, ২০১৯; চন্দ্র, ২০১৯; রায়, ২০২২)। 'উপলক্ষ্য' বিষয়টি এ পরিবেশনাগুলোতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, দর্শনীর বিনিময়ে নগরকেন্দ্রিক মিলনায়তনে আগতরা যেখানে 'দর্শক', উপর্যুক্ত পরিবেশনা উপভোগের জন্য আগত মানুষেরা সেখানে 'সামাজিকগণ' হিসেবে বিচার্য। এরা ভিন্ন মানসিকতার হয়, কারণ এদের উদ্দেশ্যই ভিন্ন। নগরকেন্দ্রিক 'দর্শক' অর্থের বিনিময়ে শিল্প বা বিনোদন ক্রয় করে আর 'সামাজিকগণ' দর্শনীর বিনিময়ে নয় বরং কখনো কখনো অর্থ প্রদান করে সামষ্টিক উদ্‌যাপনের অংশীদার হয়। তাই এই দুই ধরনের পরিবেশনার প্রকৃতিও ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। 'উপলক্ষ্য' বিষয়টি রবীন্দ্র নাট্যচিন্তা বিশ্লেষণে আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মনে করা সংগত যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পরিবার ঐতিহ্যিক পরিবেশনাগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে প্রচলের ধারাবাহিকতায় নানা উপলক্ষ্যে নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করতো। স্বাতন্ত্র্য শুধু এইটুকু যে সেখানে দর্শনীর বিনিময়ে নাট্য প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত বহু। কিন্তু 'উপলক্ষ্য' বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যচর্চা থেকে রবীন্দ্রনাট্যকে স্বতন্ত্র করবার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা বা দৃষ্টিভঙ্গি শনাক্ত করা সম্ভব। ঠাকুরবাড়ি ও শান্তি নিকেতনে নাট্য প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার লোকসমাজের পরিবেশনার আবহ, উপলক্ষ্য, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা ও প্রয়োগকে প্রভাবিত করে থাকবেই। যে কারণে গায়েনের পরিবেশনায় নানা কৃত্যাদি রয়েছে, সামষ্টিকের অংশগ্রহণ ও উপলক্ষ্য বিবেচনায় সেই একই রকম কারণে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃজনেও উপলক্ষ্যের ক্রিয়াশীলতা শনাক্ত করা সম্ভব। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে উল্লেখ্য। কাজেই প্রবন্ধকার ঐতিহ্যগতভাবে চর্চিত উপর্যুক্ত পরিবেশনাসমূহের উপলক্ষ্য, সামাজিকগণের উপস্থিতি ও পরিবেশনার কৃত্যাদি বিবেচনায় বৃহদ অর্থে এদের 'কৃত্যানুষ্ঠানিক' ('কৃত্যময়' ও 'আনুষ্ঠানিক') হিসেবে বিবেচনা করে। এখানে প্রস্তাবিত অভিধাটি 'ফরমাল' অর্থে নয় বরং 'অবশ্য পালনীয় সামষ্টিক উদ্‌যাপন' অর্থে বিবেচ্য।

পূর্ববর্তী অনেক গবেষকের মতামত থেকে এ কথা অনুধাবন করা গেছে যে, এই পরিবেশাগুলোতে কাহিনির দৃশ্যায়ন নয় বরং কাহিনির গীতমূলক পরিবেশনার মাধ্যমে জীবন ও তার নানা অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করাই মৌল প্রবণতা। গীত বা গান যেহেতু মানুষের প্রাত্যহিকতা অতিক্রান্ত একটি অভিব্যক্তি (এক্সট্রা ডেইলি) সেহেতু গীতময় পরিবেশনায় কাহিনির বিশ্বস্ত অনুকরণের চেয়ে বাস্তব-অতিক্রান্ত এক বিশেষায়িত-উদ্ভাস নির্মাণ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। সে উদ্ভাস মানুষের মনোদৈহিক জগতে যে ভূমিকা রাখে তার বিশ্লেষণ করা গেছে প্রবন্ধকারের পূর্ববর্তী গবেষণায় (অর্ক, ২০২১: ৮৯)। বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র বা দৃশ্যের 'বিশ্বাসযোগ্যতা' সৃজন নয় বরং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার ক্ষেত্রে গায়েন বা কথকের গীত পরিবেশনার সৌকর্য, স্পষ্ট করে বললে, সামষ্টিকের অংশগ্রহণ ও গায়েনের গাহনাভিনয়ের সৌকর্যের উপরে এর রস নিষ্পত্তি নির্ভর করে (অর্ক, ২০২১)। সে কারণেই লোকসমাজে বলতে শোনা যায়, 'অমুক গায়েন ভালো গায়'। গায়েনের গাহন এখানে বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়। একই মহুয়া পালা গায়েনের গাহন দক্ষতা ও পরিবেশনার পরিপ্রেক্ষিতভেদে রসের ভিন্নতা সৃষ্টি করে। 'উপলক্ষ্যে পরিবেশিত' এ সমস্ত পরিবেশনায় তাই সামাজিকগণ জানা গল্পের 'সুন্দর' গাহনাভিনয়ের রস আস্বাদন করে, কাহিনির বিশ্বাসযোগ্য দৃশ্যায়নে তাদের কোনো আগ্রহ থাকে না। কোনো একটি উপলক্ষ্যে লোকসমাজের সকলে মিলিত হয়েছে বলে সামষ্টিকের সকলের জানা কাহিনিতে 'ঘটনার ঘনঘটা' বা নাট্যোৎকণ্ঠা নয় বরং গায়েনের গাহন-সৌন্দর্য বা পরিবেশনার স্বকীয়তাই সামাজিকগণের কাছে মুখ্য হয়। তা ছাড়া লোকনাট্যের ফ্লুইডিটির প্রশ্রয়ে গায়েন যেহেতু তার পরিবেশনায় নানা পরিবর্তন আনেন সেহেতু প্রতিটি পরিবেশনাই প্রতি আসরে নতুন হয়ে সামাজিকগণের তৃষ্ণা মেটায়। সে কারণেই ইসলামউদ্দিন আর দিলু বয়াতি পরিবেশিত

একই পালা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশনা হয়ে দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের লোকসমাজে এই ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলো তাই সংস্কৃত শাস্ত্রের 'নাট্য' বা ইউরোপীয় 'থিয়েটার '(বাস্তববাদী সংলাপমূলক থিয়েটার অর্থে) থেকে স্বতন্ত্র ও এর স্বকীয় উদ্ভাসসহ জনরুচিকে তৃপ্ত করে। এটাই বাংলাদেশের ঐতিহ্যিক পরিবেশনার নন্দনতাত্ত্বিক স্বকীয়তা। জাপানের নো, কাবুকি, ইন্দোনেশিয়ার গেমলান (গামুলান), ভারতের কথাকলিসহ প্রাচ্যীয় নানা ললিতকলাতেই এ ধরনের নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন লভ্য। "How Beautifully you are displaying your art"-এরকম একটি নন্দনতাত্ত্বিক বোধ জাপানের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও নানা পরিবেশনার ক্ষেত্রে বলা হয় বলে প্রত্যক্ষ করেছেন প্রবন্ধকার নিজেই। কাজেই বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোতে গায়েন তার গীতময় পরিবেশনাতে গাহনাভিনয় কতোটা নৈপূণ্যের সাথে (স্বকীয়তা অর্থে) করছে তার উপর পরিবেশনার রস নিষ্পত্তি ঘটে, এটা বলাই যায়।

পাশাপাশি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনাময়তার কথা উল্লেখ করতেই হবে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহ কিংবা তারও পূর্ব থেকে প্রচলিত আখ্যানসমূহে সংস্কৃত নাটক বা ইউরোপীয় নাটকের মতো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন যেমন নেই তেমনি এগুলো যেহেতু গাইবার জন্যই রচিত হতো সেহেতু সেখানে কোনো যবনিকা পতনেরও অবকাশ নেই। যে-কোনো খোলা জায়গায় (উঠান/প্রাঙ্গণ) নিরাভরণ মঞ্চে বাংলাদেশের গায়েন বা কথক অবিরাম গাহনের মাধ্যমে এই কাহিনিগুলো পরিবেশন করতেন মূলত গল্প বলার ঢঙে বা বিবৃতিমূলকভাবে। বর্ণনার তোড়েই সেখানে চরিত্র বা দৃশ্যসমূহ বিধৃত হতো। কখনো কখনো গায়েন খানিকটা চরিত্রের আদলে কথোপকথন করে কাহিনি কথনকে হৃদয়গ্রাহী বা আকর্ষণীয় করতেন যা পরিবেশনা আঙ্গিক বা গায়েনভেদে ভিন্ন রকমের হয়। সমকালীন বাংলাদেশেও সেই ঐতিহ্য বহমান। গাজির গান, মনসার গান, পদ্মপুরাণ গান, কান্দনী বিষহরির গান, পদ্মার নাচন, কিস্‌সা গান ইত্যাদি পরিবেশনাগুলোতে উল্লিখিত নিরাভরণতা ও বর্ণনাময়তার নানা দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষণ করা গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক বা একাধিক দোহার গায়েনের সাথে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে এই বর্ণনাময়তার ছন্দকে বৈচিত্র্য দেয়। অধুনা নওগাঁ অঞ্চলের মোহাম্মদ সাইদুর বয়াতির পরিবেশনায় লক্ষ করা গেছে যে, তিনি একাই পুরো কাহিনির গাহনাভিনয় করেন। মাঝে মাঝে গদ্যে বর্ণনা আর পুরোটাই গাহনধর্মী বর্ণনাত্মক বয়ান (সাইদুর, ২০১৭)। দোহার সেখানে কেবল গানে সঙ্গত দান করে থাকেন, কথোপকথনে অংশ নেয় না। কাজেই বর্ণনাময়তা, অঙ্ক/দৃশ্যবিভাজনহীনতা, নিরাভরণ মঞ্চ ইত্যাদিকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্য হিসেবে শনাক্ত করা চলে। এ সমস্ত পরিবেশনায় পরিপ্রেক্ষিতভেদে তাৎক্ষণিক বর্ণনা বা সংলাপও প্রযুক্ত হয়। কখনো কখনো কাহিনির সাথে সম্পর্কহীন কথোপকথন বা গানও যুক্ত হয় কিন্তু পুরো পরিবেশনাটিতে বর্ণনার সুর বহমান থাকে (মিয়া, ২০১৪)। গায়েনের অভিনয় প্রত্যক্ষণ থেকে মনে হয়েছে যে, নানা চরিত্রের আদল নির্মাণ করে সংলাপমূলক কথোপকথনে অংশ নিলেও গায়েন কখনোই তার ব্যক্তিত্ব (গায়েন সত্তা) থেকে বিচ্যুত হন না। পরিবেশনার শেষে চরিত্রের নয় গায়েনের রূপকল্প মনে নিয়েই সামাজিকগণ ঘরে ফেরে। গায়েনের গাহনাভিনয়ের এই সাত্তিক পর্যায়ে 'উৎসব উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক' এই পরিবেশনায় গায়েনের পৌরহিত্যমূলক অবস্থানকেও প্রবন্ধকার শনাক্ত করেছেন পূর্ববর্তী গবেষণায় (অর্ক, ২০২১: ২২১-২৬৬)। তাই ঐতিহ্যবাহী এই পরিবেশাগুলোর ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত 'আনুষ্ঠানিক ও সামষ্টিক উদ্‌যাপন' বিষয়টি বিবেচনা করলে এ ধরনের পরিবেশনার এই স্বকীয়তা অনুধাবন করা সম্ভব।

কাজেই সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্যের আলোকে গীতময়তা, বর্ণনাময়তা, কৃত্যময়তা, নিরাভরণ মঞ্চ ও গাহনাভিনয় ইত্যাদিকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা চলে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই পরিবেশনাগুলোতে রস নিষ্পত্তি নির্ভর করে মূলত সামষ্টিকের অংশগ্রহণ ও গায়েনের গাহনাভিনয়ের দক্ষতার উপর। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, বাংলাদেশের

ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাসমূহে প্রধান উপাদান 'গীত' বা 'গান' নামক উপাদানটি রবীন্দ্রনাথের নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বলেই হয়তো রবীন্দ্র নাট্যচিন্তাকে ঐতিহ্য প্রণোদিত বলা হয়ে থাকে। যাত্রাগান, কথকতা, পাঁচালি ইত্যাদির প্রেরণার কথাও গবেষকদের মতামতে লভ্য। 'পালা' অভিধাটি বার বার করে এসেছে রবীন্দ্র নাট্যচর্চায়। 'নন্দিনীর পালা', 'শাপমোচনের পালা', 'ঋতু উৎসবেরই পালা', 'বৈরাগীর পালা', 'শেষ বর্ষণের পালা', 'যাত্রাপালা' ইত্যাদি নানা অভিধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানা রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। এই অভিধাটি নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বলে 'পালা' বা 'পালাগান' বিষয়টি এক্ষণে বিবেচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশের লোকসমাজে, এমনকি বিদগ্ধ মহলেও অভিধাটি নানা অর্থ জ্ঞাপন করে বলে লক্ষ করা গেছে। যেমন কাহিনি অর্থে (গুনাই বিবির পালা), পরিবেশনা অর্থে (যাত্রা পালা বা পালাগান), 'বিচার গান-কবিগান' অর্থে (পাল্লা দিয়ে দুই কবির লড়াই) ইত্যাদি। প্রবন্ধকারের পালাগানবিষয়ক গ্রন্থে এতদ্‌বিষয়ক আলোচনা রয়েছে যেখানে মূলত পূর্ব ময়মনসিংহের স্থানীয়ভাবে অভিহিত কিস্‌সাগান, লাম্বাগীত, পালাগান ইত্যাদিকে একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক অর্থে 'পালাগান' হিসেবে এক শব্দে বিবেচনা করা গেছে। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন পরিবেশ্য কাহিনি অর্থে 'পালা গান' কথাটি বিবেচ্য (অর্ক, ২০১৮: ২৯-৩০)। তাঁদের মতামত বৃহদ্ অর্থে বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য এই কারণে যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের লোকসমাজ এই মতামতের সমর্থন দেয়। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশে কাহিনি পরিবেশনার গীতমূলক সকল আঙ্গিককেই 'পালা গান' বলা চলে। যেমন ময়মনসিংহে গাজির গান-কেও 'পালা গান' নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। অধুনা রবীন্দ্রনাথের নাটককে পালা হিসেবে অভিহিত হওয়া প্রসঙ্গে শাহাদৎ রুমন (২০২২) অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, পালার বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করে, চরিত্রের মুখের সংলাপকে কখনো কখনো গায়েন-দোহার ভিত্তিক কথোপকথনের সাথে তুলনা করে কিংবা গানের পৌনঃপুনিক ব্যবহার করে গীতময়তা সৃষ্টির কারণে *রক্তকরবী*কে পালা বলা যেতে পারে—এমন অনুধাবন করা সংগত। শাহাদৎ রুমনের মতামতের সাথে মতৈক্য প্রকাশ করে বলা যায় যে, গীতময়তা ও অবিরাম বর্ণনাময়তার মাধ্যমে কাহিনি বিবৃতিকে একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বাংলাদেশের পালাগানে (বৃহদ অর্থে) সাধারণীকৃতভাবে দেখা যায়। পাঁচালি, কথকতা কিংবা যাত্রাতেও গীতময়তা ও বর্ণনাময়তা লভ্য। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পালা' বলতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর সামগ্রিক আবহ বা আদলকে অনুধাবন করেছিলেন এমন অনুধাবন করাই সংগত। কাহিনির দৃশ্যময় রূপায়ণ নয় বরং গীতময় বয়ান এ সমস্ত ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার মৌল প্রবণতা যা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মধ্যযুগ থেকে বয়ে আসা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কাব্য/নাট্যমূলক পরিবেশনাসমূহ বিচার করলে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত পরিবেশনা আঙ্গিকগুলোতে 'গান' রচনার প্রধান উপাদান বা গায়েন অভিনেতাদের প্রধান অভিব্যক্তি কৌশল। পাশাপাশি কথা এবং নৃত্যও রয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যিক এই উপাদানসমূহ রবীন্দ্র নাট্যে কীভাবে কার্যকর তার পুনর্বিবেচনা ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, সর্বোপরি তাঁর নাটক ও নাট্য প্রযোজনাগুলো বাংলাদেশে বহুল চর্চিত ইউরোপীয় রীতির নাট্য থেকে স্পষ্টতই স্বতন্ত্র অথচ সুন্দর। তাই, স্পষ্ট করে বললে, স্বকীয় নাট্যউল্লাস বা 'রস' (সংস্কৃত শাস্ত্রের নবরস অর্থে শুধু নয়) নির্মাণে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাসমূহের নানা উপাদান ও কৌশলগুলো কী কী রূপে ক্রিয়াশীল হয়ে রবীন্দ্র নাট্যসৃজনকে স্বকীয় ও অভিনব করেছিল তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তদীয় নাট্যচিন্তার প্রয়োগ দার্শনিকতা অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্র নাট্যচিন্তায় ঐতিহ্যের প্রণোদনা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে কবি, নাট্যকার, সংগীতকার, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। তাঁর কবি সত্তার মন্ময়তা (subjectivity) এবং নাট্যকার/নির্দেশক সত্তার তন্ময়তা (objectivity) যুগপৎ ক্রিয়াশীল হয়ে শিল্পের অনেক শাখায় তাঁর বিচরণকে নিশ্চিত করেছে। কিন্তু এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মন্ময়তা

ও তন্ময়তার দ্বন্দ্বকে তিনি নিরসন করেন কী করে? নাকি *বাল্মিকী প্রতিভা*, *মায়ার খেলা*, *রাজা*, *রক্তকরবী*সহ বেশিরভাগ রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে দ্বান্দ্বিকতা প্রতিপাদ্য তারই সমান্তরাল কোনো সমুদ্রে তিনি আত্মমীমাংসা খুঁজেছেন শিল্পী হিসেবেও? এ ক্ষেত্রে বাঙালির আজন্ম প্রবণতায় যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রভাব রয়েছে তা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্তঃস্রোতে যে দ্বৈতাদ্বৈততার ক্রিয়াশীলতা রয়েছে তা এ দেশের লোকধর্মগুলোর কৃত্যাদি অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করলেই অনুধাবন করা যায়। অন্যদিকে, শিল্পে জন্‌রে বা শ্রেণিসমূহ অর্বাচীনকালে ইউরোপীয় সমাজ থেকে আগত। এদেশের ঐতিহ্যে এই জন্‌রে বা শ্রেণীকরণ ছিল না। ছিল না শিল্প আর কৃত্যের ভেদও। বাংলাদেশের মধ্যযুগ বা তারও আগে থেকে পরিবেশিত কাহিনিগুলো তাই একই সাথে কৃত্য-কাব্য-নাট্য-গীত এর দ্বৈতাদ্বৈত সন্নিবেশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শুধু 'মঙ্গলকাব্য' অভিধাটি নিয়ে ভাবলেই বোঝা যায় যে যা আদিতে কেবল 'মঙ্গল' নামে চর্চিত ছিল কালের প্রবাহে তাকেই আমরা 'মঙ্গল গান', 'মঙ্গল কাব্য' কখনো কখনো 'মঙ্গলনাট্য' নামেও অভিহিত করে থাকি। বাঙালি হিসেবে আমাদের মনের মধ্যে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এরই মধ্যে কাব্যময়তা-কৃত্যময়তা-গীতময়তা-নাট্যময়তা এমনভাবে মিলে মিশে একাকার যাকে আলাদা একটি শ্রেণির নামকরণ দিয়ে অভিহিত করলে তার চরিত্র পুরোপুরি প্রকাশ পায় না। সেই দর্শনের সমান্তরাল অনুধাবন থেকে সেলিম আল দীন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব বা ফিউশনতত্ত্বের প্রেরণাকে স্বীকার করেন আর জন্‌রে অস্বীকার করে দ্বৈতাদ্বৈত এক শিল্প নির্মাণে ব্রতী হন। এভাবে ভাবলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতেও খানিকটা সুবিধা হয় বৈকি। রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃজনেও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রভাব আছে বলে তাঁর নাটক-উপন্যাস হয়ে ওঠে (*প্রজাপতির নির্বন্ধ-চিরকুমার সভা*), উপন্যাস নাটক হয়ে ওঠে (*বউ ঠাকুরানীর হাট-প্রায়শ্চিত্ত*) তাঁর হাতেই। কবিতা হয়ে ওঠে গান-গান হয়ে ওঠে কবিতা (*তাসের দেশ* ইত্যাদি), একই নাটক কখনো কাব্যনাট্য কখনো বা নৃত্যনাট্য (*চিত্রাঙ্গদা*)। তবে বিশ্লেষণের পর্যায়ে তাঁর নাট্যসৃজনকে দুই পর্যায়ে আলাদা করে আলোচনা করলে তদীয় সৃজনের নানা মাত্রিক নিরীক্ষাকে পর্যবেক্ষণ করা স্পষ্টতর হবে বলে নিম্নোক্ত দুইটি পর্যায়ে তা করবার প্রয়াস রইল:

ক) নাটক রচনায় ঐতিহ্যের প্রেরণা ও স্বকীয়তা

*রুদ্রচন্ড*কে স্বীকার করে নিয়েও *বাল্মিকী প্রতিভা* নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম মুদ্রিত রচনা হিসেবে সাধারণভাবে ধরা হয়। এ নাটকে দৃশ্য বিভাজন রয়েছে, রয়েছে চরিত্রানুগ সংলাপ, প্রবেশ প্রস্থান এবং গান। রচনার গঠন তথা আঙ্গিক বিচার করলে স্পষ্টতই লক্ষ করা যায় যে ইউরোপীয় রীতির দৃশ্যভিত্তিক নাটক রচনার তৎকালীন প্রবণতা থেকেই তিনি এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। *শারদোৎসব* রচনার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাটকের কাঠামোতে ইউরোপের রীতিকে অতিক্রম করতে পারেননি বলেই মনে হয়। বড়ো জোর সংস্কৃত নাটকের কাঠামো খানিকটা হয়তো তাঁর অভিজ্ঞতায় ক্রিয়াশীল ছিল। জানা যায় *বাল্মিকী প্রতিভা* রচনার কিছুদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ ভ্রমণ করে ফিরেছেন। অপেরার অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করেই হউক কিংবা গীতসর্বস্ব নাট্য বলেই হউক তৎকালীন ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তিতে দীক্ষিত ও অভিযোজিত শিক্ষিত সমাজ এ রচনাকে 'অপেরা' হিসেবে বিবেচনা করেছেন কিনা ভাববার বিষয় (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: প্রস্তাবনা)। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাটকটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে বলছেন, "উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা" (ঠাকুর, ১৪০২ বঙ্গাব্দ: ৪৮২)। মনে রাখা প্রয়োজন অপেরার অভিজ্ঞতাসহ বাড়িতে পিয়ানোর ব্যবহার থাকলেও একই বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসরাজ বাজাতেন, বাড়িতে যাত্রাগানের আসর হতো। *ভানুসিংহের পদাবলী*র রচয়িতা এ ভূখণ্ডের কীর্তনের অভিজ্ঞতাসহই সুরের আবহে বেড়ে উঠেছেন। কাজেই সুরময়তা বা গীতময়তার প্রতি সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত গীতিকবির ঝোঁক থাকাটাই স্বাভাবিক। জীবন সায়াহ্নে এসে রবীন্দ্রনাথ নিজেও গানের মধ্যে নাট্যরস-এর কথা স্বীকার করছেন *প্রকৃতির প্রতিশোধ*-

এর সূচনা অংশে। তাই বাংলাদেশের লোকসমাজে প্রচলিত গান ও গীতময় পরিবেশনা-আঙ্গিকগুলো যে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবি সত্তাকে কোনো প্রেরণা জোগায়নি এ কথা নিশ্চিত করে বলাটা সংগত হয় না। তার কিছুকাল পরেই তিনি *মায়ারখেলা* 'গীতনাট্য' রচনা করছেন যেখানে *বাল্মিকী প্রতিভার* গানও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। "গহনে গহনে যা রে তোরা" এই পুনরাবৃত্তির অন্যতম উদাহরণ। এই ধরনের পুনরাবৃত্তি তিনি পরবর্তীকালেও করেছেন তাঁরই অনেক নাটকে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোতেও আমরা লক্ষ করি গায়েনগণ একই গান বিভিন্ন পরিবেশনায় ব্যবহার করে থাকেন। ভাব ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গায়েন-লোককবিগণ বিয়ের গান, স্নানের গান ইত্যাদি তদীয় যে-কোনো পরিবেশনাতে ব্যবহার করেন। পারিবারিক সাংস্কৃতিক আবহের সুবাদে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার মধ্যে যখন এই ধরনের উদাহরণ আছে তখন এটা ধারণা করা যৌক্তিক যে ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক রচনায় একই গানের পুনরাবৃত্তি করেছেন। অন্যের রচিত গানও রবীন্দ্রনাথ সন্নিবিষ্ট করেছিলেন তাঁর *বাল্মিকী* প্রতিভাতে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত "কালী কালী" গানটি এর উদাহরণ। শ্যামা সংগীতের আদলে গানটি সুরারোপিত হয়েছিল। যদিও জানা যায় এই গানটি ব্রিটিশ (আইরিশ) গান "Nancy Lee" গানের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে। ফ্রেডেরিস ওয়েদারলির লেখা ও স্টিফেন অ্যাডামসের সুরারোপিত (https://roar.media/bangla/main/art-culture/tagoresforeingmusic, viewed 20 june 2022)। তবে ব্রিটিশ গানটি মার্চ বিটে করা, দ্রুত লয়ের এই ব্রিটিশ গানটির ছন্দকে ভেঙে ধীর লয়ে গানটির সুর করে যে শ্যামা সংগীতের আবহ নির্মাণ করা যায়, রামপ্রসাদী সুরের ব্যবহার যে নাট্যে হতে পারে– সত্যিই *বাল্মিকী প্রতিভা* সংগীতের নিরীক্ষা ছিল বৈকি।

নাটক রচনার এ পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত গান বা গীতময়তা রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে আপাতভাবে মনে হয়। নতুবা তাঁর বেশিরভাগ নাটকেই গানের প্রাচুর্য এবং শেষ দিককার নৃত্যনাট্যগুলো তো গান ছাড়া রচিতই হতো না। সমালোচক-গবেষকগণও এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। *ঘরোয়াতে* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "'মায়ার খেলা'য় তিনি প্রথম সুরকে পেলেন, কথাকেও পেলেন। [..] গান শুনে তবে মায়ার খেলা বুঝতে হয়" (ঠাকুর, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ: ১২৬)। এ সুর হয়তো শুধু গানের সুর অর্থে নয়। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নাটকের মূল সুর অর্থে- 'গানের সুরে নাট্যীকৃত' করবার অর্থে প্রযুক্ত। গান শুনে যদি বুঝতে হয় তা হলে গানের মাধ্যমে নাট্যরস রচিত হয় এই রকম ইঙ্গিতই করছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই নাট্যরসের কথাই তবে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *প্রকৃতির প্রতিশোধ*-এর সূচনা অংশে (ঠাকুর, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ: ৮৬)। আধুনিক কালের গবেষক শাহাদৎ রুমনও (২০২২: ১১৬) গান দিয়ে নাট্যরস সৃজনের সম্ভাব্যতা বিষয়ে এ ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন। তিনি গীতিময় এই ধরনের নাট্য অভিজ্ঞতাকে 'বিশেষ স্ফূর্তি' হিসেবে অভিহিত করে রবীন্দ্র নাটকের স্বকীয় বিনির্মাণের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরান (রুমন, ২০২২ : ১৩২)। অনুমান করা যায় যে, গানের এই স্বকীয় শক্তির কথা বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানহীন *ডাকঘর* নাটকের বিচিত্রা প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চায়নে একাধিক গান যুক্ত করেছিলেন (শেখর, ২০১৪: ১৭৩)। এমনকি আমরা জানি নৃত্যনাট্যের পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যকেও সুরারোপ করে সুরময় সংলাপের অবতারণা করেন। তখন রচনার গীতধর্ম ও নাট্যধর্ম এক দ্বৈতাদ্বৈত পর্যায়ে পৌঁছে যায় বলে মনে করা অসংগত হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই লিখছেন, "গদ্যরচনায় আত্মশক্তির, সুতরাং আত্মপ্রকাশের, ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ? (ঠাকুর, ১৪২১ বঙ্গাব্দ: ১৯৪)"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে সংগীত প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে সুব্রত ঘোষ বলছেন বিষয় ও কাঠামোকে ধরবার জন্য গানের ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (ঘোষ, ২০১৭: ৯৬)।

সত্যিকার অর্থে সুব্রত ঘোষ কিছু বিশেষ নাটকে গানের বহুময় ব্যবহার প্রসঙ্গে বলতে চাইছেন যে, গানগুলো নাটকের বিষয় এবং কাঠামোকে যুগপৎ নিয়ন্ত্রণ করছে (ঘোষ, ২০১৭: ২০)। কাজেই গান বা গীতময়তার প্রয়োগ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের পাণ্ডুলিপি থেকে দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে আমরা সমালোচকদের মন্তব্যসমূহকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারি।

বাল্মিকী প্রতিভা থেকে পদ্য বা গীতবহুল নাট্যরচনা শুরু করে *প্রকৃতির প্রতিশোধ* নাটকে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক গদ্যের অবতরণা করেন। গান কিন্তু শুরু থেকেই আছে। পরবর্তীকালে *নলিনী* হয়ে *মায়ারখেলা* পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্য মিশ্রণে দৃশ্য বিভাজন ভিত্তিক নাটকের কাঠামোকেই গ্রহণ করেছেন। তবে সেখানে গানের ব্যবহার বর্জিত হয়নি। *রাজা ও রানীতে* লিরিক বা কাব্যময়তাসহ রবীন্দ্রনাথ একেবারেই ইউরোপীয় পঞ্চাঙ্ক রীতিকে আশ্রয় করেছেন। এখানেও গানের ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য। চরিত্রের মুখে হলেও গান তিনি ব্যবহার করেছেন। একেবারেই পঞ্চাঙ্ক রীতিতে রচিত *বিসর্জন* নাটকে অপর্ণার গান, জয়সিংহের গান, নেপথ্যের গান ইত্যাদিও এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা* রচনার সময় তিনি প্রথমবারের মতো দৃশ্য বিভাজন বা অঙ্ক বিভাজন বর্জন করে নম্বর জুড়ে দিয়ে ১১টি পর্বে ভাগ করে নাটকটি রচনা করেন। সেখানে আলাদা করে গান না থাকলেও গীতিকবির পদ্যের কাব্যময়তায় গীত এর আহ্বানকে নিশ্চিত করেছেন। তা ছাড়া পরবর্তীকালে গীতসর্বস্ব নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা* পুনর্বার রচনা থেকেই বোঝা যায় যে, কাব্যনাট্যের পদ্যের মধ্যেই গীতধর্ম লুক্কায়িত ছিল। কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*-র পর *শারদোৎসব* রচনা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কাব্যে বা গদ্যে সংলাপমূলক, কখনোবা দৃশ্যবিভাজনসহ নাটক রচনার নিরীক্ষণ করেছেন। এ নিরীক্ষণ অবশ্য তিনি শেষ বয়স পর্যন্তই অব্যাহত রেখেছিলেন। *শারদোৎসব* থেকে রবীন্দ্রনাথ 'গানময়' নাট্য রচনার দিকে মনোনিবেশ করে তার নাট্যচিন্তার একটি নতুন পর্যায়ে পৌঁছান। এ নাটকটি গদ্যে রচিত হলেও গান দিয়ে শুরু এবং গান দিয়েই এর সমাপ্তি। যেন বাঙালির কোনো পার্বণের ঐতিহ্য থেকে গাঠনিক আদলটি খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শঙ্খ ঘোষ *ফাল্গুনী*, *শারদোৎসব* ইত্যাদি নাটকে ঐতিহ্যের আধুনিকায়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'নতুন যুগের রিচুয়াল' নির্মাতা হিসেবে বিবেচনা করছেন। *ফাল্গুনী* নাটক অভিনয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকে লোকজীবনের প্রতিফলন উপলক্ষ্যে বলছেন, "[..] তিনি দর্শক আর অভিনেতাদের মধ্যে অনায়াস যোগ খুঁজছিলেন অথচ প্রচলিত রীতির বাইরে এসে নাটককে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন নাচগানের সম্মিলিত পার্বণে" (ঘোষ, ২০১৫: ২৭৮-২৭৯)। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের লোকমানসে গীতপ্রিয়তা, আবহমানকাল থেকে বয়ে আসা আখ্যান কাব্যসমূহের গীতময় প্রবাহমানতা ইত্যাদি অঙ্কবিভাজন সম্বলিত ইউরোপীয় রীতির সংলাপমূলক নাট্য রচনার বদ্ধমূল ধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাংলার গ্রামীণ প্রান্তরের উদার জমিনে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল এই *শারদোৎসবের* পর থেকেই। অবশ্য এরই পূর্বে ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তাঁর যাত্রার প্রতি পক্ষপাত ও ইঙ্গিতময় নিরাভরণ নাট্যের প্রতি তদীয় প্রিয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্ক/দৃশ্যবিভাজন নিয়ে নিরীক্ষা, গদ্য-পদ্যের যুগল মন্থন, গীতের বহুময় প্রয়োগ ইত্যাদি নানা প্রয়াসের মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে এসে নৃত্যনাট্যে থিতু হন। তবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য নাট্য ইউরোপীয় নাটকের গঠন থেকে মুক্তি পেলেও রবীন্দ্রনাথের গানের শাসন থেকে মুক্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য বিষয়ে রমাপদ চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি দিয়ে সুব্রত ঘোষ বলতে চাইছেন যে তাঁর নৃত্যনাট্যে নৃত্য গানের অনুবর্তীই ছিল, নৃত্যের টেকনিক কখনো গানকে অতিক্রম করে যেত না কারণ রবীন্দ্রনাথ তার নিজের গানের ভাব অনুসারে 'ভাবনৃত্য' রচনা করতেন (ঘোষ, ২০১৭: ১৭৭)।

নৃত্যবিষয়ক বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আলোচ্য বলে এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনায় গানের প্রয়োগের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি। শঙ্খ ঘোষের মতো অনেক সমালোচকই গানের ব্যবহারের প্রেরণা হিসেবে বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের মধ্যে এর বীজ অন্বেষণ করে

পালাগানের মধ্যে তা খুঁজে পেয়েছেন। তার কারণ হিসেবে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি নাটককে 'পালা' বলে অভিহিত করেছেন। *শারদোৎসব*–'ঋতু-উৎসবেরই নাটকের পালা', *ফাল্গুনী*–'বসন্তের পালা', *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা* প্রসঙ্গে–'নটরাজ পালাগানের এই মর্ম্ম', *রক্তকরবী*–'নন্দিনীর পালা', *শাপমোচন*–'শাপমোচনের পালা', *প্রায়শ্চিত্ত*–'*বৈরাগীর পালা*', *রাজা*–'সুদর্শনার পালা' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: ২৫৯) ছাড়াও বহু চিঠিপত্র-প্রবন্ধাদিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাটক বা নাট্য প্রযোজনাগুলোকে বিভিন্ন অর্থে পালা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নাটকাদিকে পালা হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির গঠন থেকে দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করা যাক।

বাল্মিকী প্রতিভা থেকে শুরু করে *মুক্তির উপায়* বা *মালঞ্চ* পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ নাট্য পরিক্রমায় গানবিহীন নাটকের সংখ্যা ৫-৬টির বেশি নয়। তার মধ্যে কোনো কোনো নাটকে তিনি পরবর্তীকালের অভিনয়ে গান যুক্ত করেছেন (*ডাকঘর*)। গান দিয়ে শুরু এবং শেষ, চরিত্রের মুখের গান, কিংবা গানের প্রস্তাবনাযুক্ত নাটকের সংখ্যাই বেশি। *শারদোৎসব* নাটকের শুরু এবং শেষ গান দিয়ে যাকে তিনি বলছেন 'ঋতু উৎসবেরই পালা'। সম্ভবত তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী উৎসব পার্বণে যে গীত-সর্বস্বতা সেই অর্থেই, অর্থাৎ 'ঋতু উৎসব'– এই 'বিষয়বস্তু নিয়ে আবর্তিত কাহিনির গীতময় রচনা' অর্থে এই নাটককে পালা বলছেন। *ফাল্গুনী* নাটকেও সেই গীতসর্বস্বতা রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের 'গীতি-ভূমিকা' যুক্ত রয়েছে। নাটকের সমাপনীও হয়েছে উৎসবের গান দিয়ে। এই নাটকেও বিষয়বস্তু বসন্ত উৎসব। এর গীতময় রচনা হলো গাঠনিকভাবে, তাই রবীন্দ্রনাথ একে 'বসন্তের পালা' বললেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দৃশ্য বিভাজন একেবারে বর্জন করেননি। কিন্তু অন্তরে ঐতিহ্যের অনুরণন রয়েছে বলে এই গীতময় রচনাকে তিনি পালা বললেন। গানকে কেন্দ্র করে পালা রচনা বা কাহিনিকে গানে বেঁধে পালা রচনার ঐতিহ্য বাংলা জনপদে বহু দিনের। সেই ঐতিহ্যর প্রেরণাতেই তবে তিনি শরৎ কালের উৎসবের জন্য রচিত গান নিয়ে *শারদোৎসব*, বসন্তের জন্য রচিত গান নিয়ে *ফাল্গুনী* (বসন্তের পালা) কিংবা *নটরাজ* জাতীয় রচনা করেছিলেন এমন ধারণা করা সংগত। তা ছাড়া নাটককে 'গানময়' করে তোলার কবির বাসনা তাঁর ভাষ্যেই পাওয়া যায় (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: ২৬৫)। গানময় করে তুলতে গিয়ে তিনি রচনার আদর্শ হিসেবে ঐতিহ্য থেকে পালা গানের আদলকেই যে বেছে নিয়েছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালাতে*। নাটকটিতে তিনি 'উদ্‌বোধন' শিরোনাম দিয়ে পালা গানের আদর্শে বন্দনাও রচনা করেন:

[..] প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর কাঁপে দুরু দুরু [..] (ঠাকুর, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ: ৩৩১)

যেন সমকালীন পালাগানের বন্দনার এক বিনির্মাণ:

[..] আমি/ চারকুণা বন্দনা করেগো আমি মন করিলাম স্থির
তীরের আগায় বান্ধিয়াগো গেলাম আশি হাজার পীর
আবার ওস্তাদের চরণ বান্ধলাম বসিয়া আসরে
আমার শিক্ষাগুরু কুদ্দুস মিয়া কেন্দা জেলায় বারে [..] (অর্ক, ২০১৮: ৮৯)

একই নাটকের শেষে 'দোল' শিরোনাম অংশে আরেকটি গান দিয়েই নাটকের শেষ হয়। *ফাল্গুনী* নাটকে যেমন উৎসবের গান দিয়ে শেষ হয়েছিল। বাংলাদেশের পালাগানেও (বিশেষত ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিস্‌সা গানে) একটি সমাপনী সংগীতের মধ্য দিয়ে পরিবেশনা শেষ হয়। প্রবন্ধকারের গবেষণায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর এই সাধারণ গঠন আলোকিত হয়েছে (অর্ক, ২০১৮: ১৫৩)।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশাগুলোর মতো কাহিনিকথন বা গল্পবলার যে বর্ণনাময়তা তাতে গীতময়তাকে অভেদ ও অনিবার্য আকারে যুক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ লোককবির সহজতার ঢঙেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ *শাপমোচন* নাটকের একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল:

গান্ধর্বের দূত এল মদ্রারাজধানীতে। বিবাহ-প্রস্তাব শুনে রাজা বললে, "আমার কন্যার দূর্লভ ভাগ্য"।

সখীরা রাজকন্যাকে গিয়ে বললে-

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে বাজিবে।
[..]
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে।।

এই নাটকটির পুরোটা জুড়েই এই বর্ণনাময়তা আর গীতময়তার অভেদ আলিঙ্গন যা আমাদের লোকসমাজে পরিবেশিত পালাগান, কীর্তন বা কথকতার গায়েনদের মধ্যে দেখা যায়। বলা যায় আধুনিককালের বর্ণনাত্মক বাংলা নাট্য রচনার যে সেলিম আল দীন-প্রবর্তিত-পথ তার সূচনার কম্পন রবীন্দ্রনাথের হাতেই। পালা বা ঐতিহ্যবাহী নানা পরিবেশনার আদলই এই গীতময় বর্ণনাময় রচনার দিকে রবীন্দ্রনাথকে প্রণোদনা দিয়েছিল। কাজেই গান, গীতময়তা ও বর্ণনাময়তার এক দেশজ আদর্শের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনায় তদীয় নানা নিরীক্ষার মধ্যেই এদের কোনো কোনোটিকে পালা বলে সম্বোধন করেছেন–এ কথা বলাই যায়।

প্রায়শ্চিত্ত, অরূপরতন ইত্যাদি নাটকেও গীতময়তার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। কিন্তু সবগুলোকে তিনি পালা বলছেন এমন কোনো তথ্য নেই। তবে কি বিষয়বস্তু অর্থেই 'পালা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ? যেমন *রক্তকরবী*কে 'নন্দিনীর পালা' (নন্দিনীবিষয়ক কাহিনি), *রাজা*কে 'সুদর্শনার পালা' (সুদর্শনাবিষয়ক কাহিনি)? এই নাটক দুটিতে গানের ব্যবহার থাকলেও 'গানময়' বলবার মতো গানের স্পষ্ট প্রাচুর্য এ নাটকগুলোতে নেই। তা হলে রবীন্দ্রনাথ এগুলোকে পালা বলছেন কোন অর্থে? পূর্বেই বলা হয়েছে 'পালা' অভিধাটি আমাদের সমাজে বহু অর্থে প্রযুক্ত। হয়তো রবীন্দ্রনাথও ঐতিহ্যবাহী এই অভিধাটির বহুময়তার অনুধাবন করেছিলেন।

তাই বলা যায়, এ পর্যায়ে রচনার গঠনে দৃশ্যবিভাজন কিংবা অপেরার প্রভাব আপাত দৃশ্যমান হলেও বাংলার লোকজীবনের গীতময়তা-বর্ণনাময়তর ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্ময়তার গোপন ও একান্ত স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাই গীতময়তা দিয়ে তার নাট্য প্রচেষ্টার সূচনা এবং শেষ পর্যায়ের নৃত্যনাট্যের রচনাগুলোও গীতসর্বস্ব।

নাটক রচনায় ঐতিহ্যবাহী যাত্রা ও বাংলার লোকজীবনের নানা অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলে সাধারণভাবে আলোচনা রয়েছে (ঘোষ, ২০১৭: ২৫)। যাত্রার গীতপ্রাধান্যযুক্ত উচ্চকিত অভিনয়ের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা কর্তব্য। যাত্রায় গীতময়তার প্রতাপ বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতারই ফলাফল হিসেবে মেনে নেওয়া যায় এই কারণে যে প্রাচীন, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পরিবেশনার ক্রমপর্যায়িক বিবর্তনেই যাত্রার উদ্ভব। গীত সেখানে প্রধান উপকরণ ছিল। গীতময়তার আলোচনা হয়ে গেছে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে। এবারে তাই যাত্রার অন্য একটি দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাওয়া যাক। আমরা জানি ঠাকুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ করে যাত্রা পরিবেশনার আয়োজন হতো। যাত্রার প্রভাব যে ঠাকুরবাড়িতে আগে থেকেই ছিল তার প্রমাণস্বরূপ যাত্রার আদলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *সরোজিনী*ও প্রযোজিত হবার কথাও জানা যায় (চক্রবর্তী, ১৯৯৫; ঘোষ, ২০১৭; ঠাকুর, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ; চৌধুরানী, ২০২১)। এবারে রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনায়, মূলত চরিত্র সৃজনের ক্ষেত্রে যাত্রার প্রেরণা অনুসন্ধান করা যাক। বেশিরভাগ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী,

দাদাঠাকুর ইত্যাদি চরিত্রের আদলের মধ্যে যাত্রাপালার 'বিবেক' নামক ভূমিকার (role) প্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন। এই ভূমিকাটি (কেউ কেউ চরিত্রও বলছেন) বাংলাদেশের লোকজীবনে পরিচিত বাউল, বৈষ্ণবদের মতো গান করে, মুক্তির সাধনা করে এবং যাত্রার কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করে লোকসমাজে মুক্তির তত্ত্ব ছড়িয়ে বেড়ায়। বিবেক ভূমিকার সাথে আপাত সদৃশ কিংবা তার প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের সৃজিত উপরিউক্ত চরিত্রগুলো এক ধরনের 'স্টক/টাইপ চরিত্র'। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ১১টি নাটকে ঠাকুরদাদা/ঠাকুর্দা/দাদা ঠাকুর বা ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো টাইপ চরিত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

শারদোৎসব নাটকেই প্রথম ঠাকুরদাদা চরিত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়। সে বালকদের সাথে খেলা করে। বাউলের মতো গান করে মুক্তির তত্ত্ব সহজিয়া ঢঙে আমাদের জানিয়ে দিয়ে যায়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি পর্যবেক্ষণ করা যাক:

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ
গান
বাউলের সুর
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরির খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে।
সাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক। ঠার্কুদা, তুমি আমাদের দলে।
দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুর্দা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।
ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে-সব হয়ে-বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর।-

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা! (ঠাকুর, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ: ৬৪৩-৬৪৪)

এই ঠাকুর্দা চরিত্রটির সাথে *প্রায়শ্চিত্ত* বা *মুক্তধারা* নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের মিল লক্ষ করা যায় যা অনেক সমালোচকই পর্যবেক্ষণ করেছেন। চরিত্র দুটি সহজ আনন্দের ছলে মুক্তির তত্ত্ব বলে যান কিংবা গেয়ে যান। *মুক্তধারা নাটকে "আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে"* গানটির মধ্যেও পার্থিব জীবনে মুক্তির তত্ত্ব গেয়ে যায় ধনঞ্জয় বৈরাগী। একইভাবে *রাজা* নাটকে ঠাকুরদা সুদর্শনাকে তত্ত্বকথা শোনায় ও গান করে, যোদ্ধাবেশে প্রবেশ করে রাজার গুঢ় তত্ত্বও বুঝিয়ে দিয়ে যান। *অচলায়তন* নাটকেও মহাপঞ্চকসহ অচলায়তনের সকলকে মুক্তির তত্ত্ব শেখান, ডাকঘর নাটকে অমলকে রাজার চিঠির খবর দিয়ে যান। একই ধরনের কাজ তিনি (অথবা ধনঞ্জয় বৈরাগী) করেন *ঋণশোধ, অরূপরতন, পরিত্রাণ* নাটকেও। যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্ময় সত্তার প্রতিফলন দেখা যায় চরিত্র দুটির কথা ও গানে। গান এবং নাটকে চরিত্র দুটির দর্শনগত ঐক্যের দিক বিবেচনা করলে *বাল্মিকী প্রতিভা*র চাঁদ কবি কিংবা *মায়ার খেলা*-র মায়াকুমারীগণও একই ধরনের ভূমিকা রাখে বলে শনাক্ত করা সম্ভব। এই টাইপ চরিত্রগুলোর মতো যাত্রাতে বিবেক নামক টাইপ ভূমিকাটি একই কাজ করে বলে আমরা উল্লেখ করেছি। কাহিনির কোনো নাটকীয় মুহূর্তে, চরিত্রের কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে বিবেক মঞ্চে প্রবেশ করে একটি গান পরিবেশন করে যা মুক্তির পথ দেখায় কিংবা চরিত্রকে প্রবোধ দান করে এইভাবে:

'ওরে আপন বুঝে চল্ এ বেলা। (আহমেদ, ১২ মে ২০১৯)'

যাত্রা প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করা গেছে যে, বিবেক মঞ্চে চরিত্রগুলোর সাথে কথোপকথন করে না। বরং তত্ত্বমূলক গান পরিবেশন করে। কাজেই নাটকে তত্ত্বকথা, জীবনবোধের দার্শনিকতা ইত্যাদি সঞ্চারণের ক্ষেত্রে গীতময়তা প্রয়োগের মাধ্যমে বিবেকের যে ভূমিকা উল্লিখিত ঠাকুর্দা বা ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা প্রায় সমান্তরাল। সহজিয়া আনন্দ এবং সংগীতময়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তো বটেই। পার্থক্য শুধু এখানেই যে বিবেক অন্য চরিত্রের সাথে সাধারণত কথোপকথনে অংশগ্রহণ করে না কিন্তু ঠাকুর্দা/ ধনঞ্জয় কাহিনির বা দৃশ্যের অংশ হয়ে মিশে যায়। এটা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃজন যার প্রেরণায় সমালোচকদের পর্যবেক্ষণকৃত যাত্রার বিবেক কিংবা লোকসমাজে দৃষ্ট বাউল, বৈষ্ণব বৈরাগীর অস্তিত্ব অনুধাবন যথার্থ বলেই মনে হয়।

একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনার ক্ষেত্রে আঙ্গিক অন্বেষণ থেকে শুরু করে গাঠনিক স্বকীয়তা, চরিত্র সৃজন, স্বকীয় নাট্যরস অনুসন্ধান ইত্যাদি সকল পর্যায়েই নিরীক্ষা করে গেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে পঞ্চাঙ্ক রীতি ও দৃশ্য বিভাজনযুক্ত নাটক রচনা দিয়ে শুরু করে একটি পর্যায়ে এসে তা থেকে বেরিয়ে এলেও (কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা)* পরবর্তী অনেক রচনায় দৃশ্য বিভাজনের মধ্য দিয়ে (*শারদোৎসবে*ও দৃশ্য বিভাজন আছে) এক ধরনের এপিসোডিক গঠনকেও তিনি ব্যবহার করেছেন। মূলত রাজা-র পর থেকেই তিনি নম্বর দিয়ে একের পর এক এপিসোডিক দৃশ্যাদি রচনা করেছেন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী আখ্যানকাব্যগুলোর মতো। সেখানে নিরেট বর্ণনা না থাকলেও এক ধরনের বর্ণনাত্মক দৃশ্যায়ন লক্ষ করা গেছে অনেক নাটকেই (*শাপমোপচন, নবীন* ইত্যাদি)। *রক্তকরবী* নাটকের পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর অন্বিষ্ট আঙ্গিকের সংহত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন যেখানে গীতময়তা, বর্ণনাময়তা, দৃশ্যবিভাজন লোপ ইত্যাদি সকল কিছু মিলে এক স্বকীয় রাবীন্দ্রিক নাটক রচিত হলো। সেখানে ঐতিহ্যের প্রেরণা হিসেবে পালাগানের গীতময়তা ("পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" গানটি বার বার ফিরে ফিরে আসা ছাড়াও বিশু পাগলের গান), যবনিকা পতন বর্জন, চরিত্রাদির মুখে সংলাপের মধ্যে বর্ণনাময়তার ঐতিহ্যিক প্রবাহমানতা (রাজা ও নন্দিনীর সংলাপ), বাংলাদেশের লোকজীবন ও তা থেকে নেওয়া চরিত্র (ঋতু বৈচিত্র্যের উৎসব-পার্বণ, বিশু পাগল ইত্যাদি) এবং মুক্তির তত্ত্বের মধ্যে লোকধর্মের মটিফ (গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে অনুসৃত প্রেমে মুক্তি) ইত্যাদি শনাক্ত করা চলে। শেষ পর্যায়ে শান্তি নিকেতনে থাকা অবস্থায় ঋতুভিত্তিক যে নাট্য ও নাট্যমূলক পরিবেশনাগুলো তিনি রচনা করেছিলেন সেগুলোতে (*বর্ষামঙ্গলের পালা, শেষ বর্ষণের পালা,* ইত্যাদি) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সূত্রধারের ভূমিকায় থেকে কথা-কবিতা দিয়ে গানগুলো গ্রন্থনা করে (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: ১৫৫-১৮৯) এমন এক ধরনের নাট্যমূলক পরিবেশনা রচনা করেন যা 'নাচ গানের সম্মিলিত পার্বণ' (ঘোষ, ২০১৫: ২৭৯)। এ যেন ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক মননশীলতার অপূর্ব মিশেল যাকে 'বিনির্মাণ' বলে শনাক্ত করেছেন শাহাদৎ রুমন। কুমার রায় (১৯৮৭: ৬২) বলেছেন, ঐতিহ্যিক প্রথা প্রকরণ ও যাত্রা নাট্যের প্রভাবপুষ্ট 'ঋতুচেতনা, রিচুয়াল ও সংগীতের আধুনিক বিন্যাস'। কাজেই নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তর্গত চেতনায় ঐতিহ্যের প্রেরণা ক্রিয়াশীল থেকে এক স্বকীয় নবায়নসহ আধুনিকতার উদ্বোধন ঘটিয়েছিল এ কথা বলাই যায়।

খ) রবীন্দ্র নাট্যচিন্তা: প্রয়োগে

১৮৮১ সালে গীতিনাট্য (শান্তিদেব ঘোষের মতে অপেরা) দিয়ে নাটক রচনা শুরু করলেও পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে তার আগে থেকেই নাটক, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদির সাথে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়েছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। এরপর নানা নাটক রচনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তদীয় নাট্যচিন্তা খানিকটা ব্যাখ্যা করেন যেখানে সংস্কৃত নাট্য ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী যাত্রার প্রতি তাঁর অনুরক্তি প্রকাশ পায়। তারপর ১৯০৮ সালে *শারদোৎসব* রচনা ও পরবর্তীকালে প্রযোজনার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের উক্ত নাট্যচিন্তার নানা প্রয়োগ নিরীক্ষা

লক্ষ করা যায়। দৃশ্যপটের সহজতা, উৎসব-পার্বণমূলক নাট্য পরিবেশ, গান নির্ভর এক ধরনের সাংগীতিক অভিনয়, নৃত্যনাট্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি স্বকীয় এক নাট্যচর্চায় পৌঁছে যান। ঠাকুরবাড়িতে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য সম্পর্কে নানাজনের স্মৃতিচারণ রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে জোঁড়াসাকো থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় (১৮৬৫) যাত্রার অবদান ছিল (ঘোষ, ২০১৭: ৪০)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের বয়ানেও যাত্রাপালার অভিনয়ের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন অনেকেই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবীর মতো প্রত্যক্ষদর্শী সহ-অভিনেতাদের বয়ানেও জানা যায় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে ঠাকুরবাড়িতে নিজস্ব নাট্যচর্চার যে প্রচলন তারই পথ ধরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটক রচনা, অভিনয় ও নির্দেশনাতে এগিয়ে আসেন। নানা তথ্য, উপাত্ত এবং স্মৃতিচারণের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনার প্রয়োগ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সে সমস্ত নিরীক্ষা বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পাওয়া গেল।

জানা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *সরোজিনী* (যা যাত্রার আদলেও পরিবেশিত হয়েছিল) নাটকটির রচনায় 'নাট্যিক যুক্তিতে' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদ্য-সংলাপের প্রস্তাব করে 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি লিখে দিয়েছিলেন (ঘোষ, ২০১৭: ৪৯)। সেই সময় থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যায়ে নৃত্য নাট্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে স্বকীয় নাট্যপ্রয়োগ নিরীক্ষা করেছিলেন তাতে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন নাট্য প্রদর্শনীর 'উপলক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষিত' বিষয়টির উপর। কেননা প্রায়োগিক শিল্প বিবেচনায় প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাংলাদেশের লোকসমাজে পরিবেশিত ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলো কোনো না কোনো উপলক্ষ্যে সকলের মাঝে অনুষ্ঠিত হয়। মানত, বিবাহ বা সামাজিক পার্বণ, কখনোবা রাষ্ট্রীয় উৎসব উপলক্ষ্যে লোকসমাজের সামষ্টিক মানুষ একত্র হয়ে সেই পরিবেশনাগুলো প্রত্যক্ষণ করে। এ এক যৌথ উদ্‌যাপনের পরিবেশ। শহরকেন্দ্রিক থিয়েটারে টিকেটধারী দর্শক মিলনায়তনে যে পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে তা থেকে এই পরিবেশ আলাদা। পরিপ্রেক্ষিত আলাদা হওয়ার কারণে এই দুই পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত রসের প্রকৃতিও ভিন্ন হবে এটা ভাবাটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের পথ ধরে ঠাকুরবাড়িতেও নানা উপলক্ষ্যে নাটক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো। পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোনো সাহেব-মেমদের আগমন, কোনো আত্মীয়ের আগমন, ঋতুবদলের উদ্‌যাপন (ঠাকুরবাড়ি ও শান্তিনিকেতনে) ইত্যাদি উপলক্ষ্যে নাটক প্রদর্শনের খবর জানা যায় (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: ৩৩, ৪২, ১০৩, ১৪৫; ঠাকুর, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ: ১৬, ৯৭)। এই প্রদর্শনীগুলোর কোনো কোনোটিতে টিকিট বিক্রয় করা হয়ে থাকলেও তা সাধারণ রঙ্গালয়ের মতো নিয়মিত দর্শনীর বিনিময়ে বিনোদন বিক্রয়ের জন্য নয়। কখনো কখনো কারো সাহায্যার্থে অথবা কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠন সমাজ ইত্যাদি স্থাপনের নিমিত্তে তহবিল সংগ্রহের জন্য এই টিকিট বিক্রয়। টিকিট বিক্রয় করে জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে যে পেশাদারি নাট্য প্রদর্শন ঠাকুরবাড়ির নাট্যচর্চা তা থেকে অনেক দূরে। বরং বাংলাদেশের লোকসমাজে প্রচলিত পালা-পার্বণে যে যৌথ উদ্‌যাপন তার চরিত্রের অনেক কাছাকাছি ছিল ঠাকুরবাড়ির নাট্যচর্চা। তাই সেই নাট্যের প্রকৃতিও ছিল খানিকটা ceremonial বা 'কৃত্যমূলক' বা আনুষ্ঠানিক। এখানে কৃত্য বলতে ধর্মীয় কৃত্য নয় বরং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সামষ্টিকের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সামাজিক আচারমূলক ক্রিয়াকে বোঝানো হচ্ছে। বাংলাদেশের লোকসমাজে এই ধরনের অনুষ্ঠানাদিতে গান বা গীতময় আবহ যে সর্বত্র বিরাজমান থাকে তা বাঙালিমাত্রই জানে। মেলা, পার্বণ ইত্যাদিতে বাউলগান, কীর্তন, পালাগান ইত্যাদি এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে দেখা যায়। কাহিনি কথন বা গানের মাধ্যমে গল্প শোনানোর রীতিও বাংলাদেশের লোক পরিবেশনাগুলোর আদি রীতি (রায়, ১৯৮৭: ২০)। এ সমস্ত পরিবেশনাতে কৃত্য, কাহিনি, চরিত্র, গীত সব মিলে মিশে এমন এক অদ্বৈত উদ্ভাস তৈরি হয় যাকে 'গান-উৎসব', 'পালা-উৎসব', 'পার্বণ' ইত্যাদি যে-কোনো নামে ডাকলেই এর চরিত্র প্রকাশ পায়। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দ্বিপাক্ষিকতার এক স্বকীয় রসায়নে সেখানে যে রস তৈরি হয় তা ইউরোপীয় নাট্যের বা থিয়েটারের দ্বান্দ্বিকতার উত্তুঙ্গ অবস্থা বা ক্যাথারসিস থেকে অবশ্যই ভিন্ন। তাই বাংলাদেশের

ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা যাত্রা, পালা, পাঁচালি, কীর্তন, আলকাপ, মনসার গান ইত্যাদির পরিবেশনায় উদ্ভূত রসকে বিবেচনা করতে হলে সেই পরিপ্রেক্ষিত, 'সিরিমোনিয়াল' পরিবেশ ইত্যাদি অনুধাবন করা প্রয়োজন। একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যচর্চাকেও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর 'সিরিমোনিয়াল' বৈশিষ্ট্যটিকে পাশে রেখে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কেননা রবীন্দ্রনাথ নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর লোকসমাজ ও লোকজীবনের অভিজ্ঞতার দিকেই শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়েছিলেন বলে আপাতভাবে মনে হয়।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর গান-সর্বস্বতা নিয়ে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। নাটক রচনার ক্ষেত্রে গানের সংযোজনা বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এবারে গানসমূহের প্রয়োগে গীতময়তার রবীন্দ্র নিরীক্ষা নিয়ে আলোকপাত করা যাক। গান রচনা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নাটক রচনার আগে থেকেই শুরু হয়েছে যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা গেছে। নাট্যচর্চার পুরোটা জুড়েই যে গানময়তা রয়েছে তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, শঙ্খ ঘোষ, কুমার রায়সহ সকল সমালোচকই স্বীকার করেছেন। ব্যাপারটা এমন যে গান শুধু নাটকের কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, শেষ পর্যায়ে গানগুলোই যেন নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে (ঘোষ, ২০১৭: ২০)। *শারদোৎসব*-এ যেমন শরৎকালের জন্য রচিত গানগুলো নিয়েই নাটক, তেমনি *শেষ বর্ষণ*, *ঋতুরাজ রঙ্গশালা*, *বসন্তের পালা*, *বর্ষামঙ্গল* ইত্যাদিতে যেন গানগুলো গ্রন্থনা করেই নাট্য রচিত ও পরিবেশিত হয়। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ঋতু নাট্যগুলিতে বাংলাদেশের লোকজীবনে ঋতুভিত্তিক উৎসব-পার্বণের পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত ও 'সিরিমোনিয়ালিটি' উদ্ভূত হয়। উপরে আলোচিত বাংলাদেশের উৎসব পার্বণের সার্বিক আমেজ বিবেচনা করলে এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটিও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রেরণা হিসেবে শনাক্ত করা চলে।

শুধু রচনায় নয়, রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রয়োগেও গানগুলো সেই 'সিরিমোনিয়াল' বৈশিষ্ট্যের নানা মাত্রা তৈরি করে। নৃত্যনাট্য ও ঋতুনাট্যগুলোর প্রযোজনা বিচার করলে দেখি যে প্রতি ঋতুর লগ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত গানগুলো নিয়েই নাট্যমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন যেখানে তিনি সূত্রধরের ভূমিকায় মঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে গান ও নাচগুলোকে গ্রন্থিত করতেন গায়েনের মন্ময়তা নিয়ে (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: ১৮৭-১৮৯)। এতদ্‌বিষয়ে প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে বিশদ আলোচ্য। রবীন্দ্র নাট্যে গানগুলো আবার স্বরলিপি অনুসারেই সবসময় গাইতে হতো তা নয়, জানা যায়, কিছু কিছু গান স্বরলিপির নিয়ম অতিক্রান্ত অভিনয়ের মতো করে গাইতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনা মোতাবেক (সিকদার, ২০১৪: ১৪৮)। আবার গানের জন্যই অভিনয়রীতিতেও পরিবর্তন আনতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে এমন ধারণাও যুক্তিসংগত। নৃত্যনাট্যের পর্যায়ের নাটকগুলোর প্রযোজনাতে অভিনয়ের সেই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গানেই যখন সংলাপ রচিত তখন অভিব্যক্তিতে পরিবর্তন আসাটা স্বাভাবিক কারণ গান একটি এক্সট্রা ডেইলি পর্যায়ের অভিব্যক্তি যা মানুষকে প্রাত্যহিকতার স্তর থেকে এক্সট্রা ডেইলি স্তরে নিয়ে যায়। তাই গানে যদি অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে হয় তা প্রাত্যহিকতা অতিক্রান্ত বিবর্ধিত, স্টাইলাইজড হবে এটাই স্বাভাবিক। সেটাই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নৃত্য বা নৃত্যাভিনয়। শঙ্খ ঘোষ নৃত্যকে গানের অভিনয় হিসেবে শনাক্ত করেছেন (ঘোষ, ১৯৬৯: ১৪১) ।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের চর্চা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোনো রীতির নৃত্যের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখাননি। বেশিরভাগ নৃত্যনাট্যেই মণিপুরী, দক্ষিণী, জাভা দ্বীপের নৃত্য ও আরও অন্যান্য অনেক রীতির নৃত্যের মিশ্রণ লক্ষ করা যায় তাঁর নৃত্যনাট্যে। দ্বিতীয়ত, লক্ষ রাখা প্রয়োজন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলোতে গানেরই প্রাধান্য। গানগুলোর ভাব ও কথাকে নির্ভর করেই নৃত্যের অনেক কম্পোজিশন করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানগুলো ছাড়া নৃত্যনাট্যগুলোর কোনো স্বার্থকতা নেই। বরং নৃত্যহীন গীতনাট্য বা গীতমূলক নাট্য হিসেবেও এগুলোর

রস উপভোগ করা চলে। গান বা গাহনাভিনয় সেখানে রস সৃষ্টির নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায় বলে মনে করা সংগত। কেননা রবীন্দ্রনাথের অনেক নৃত্যনাট্যের গান মুক্ত গান হিসেবেও শ্রোতার মধ্যে অনুভূতির সঞ্চার করে। যেমন *চিত্রাঙ্গদা*-র 'বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে কিংবা *শ্যামা*র 'ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে' ইত্যাদি গানগুলো আপনার শক্তিতেই দর্শক-শ্রোতার হৃদয়ে রস সৃজন করে থাকে। প্রতিমা দেবী, ইন্দিরা দেবী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই রবীন্দ্রনাথের গানের শক্তিকে নৃত্যের আগে স্থান দিয়েছিলেন বলে সমকালের সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৪: ১৪৫) সহজেই মতামত প্রকাশ করেন, "রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য তাঁর গীতাভিনয়েরই অঙ্গ। আগে সঙ্গীত, সেই সঙ্গীতেরই অনুযাত্রা নৃত্য।" প্রবন্ধকার তাঁর পূর্ববর্তী গবেষণাতে গাহনাভিনয় প্রসঙ্গে সমান্তরাল একটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যগুলোর অভিনয় প্রসঙ্গে (অর্ক, ২০২১: ৫৪-৫৫)। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পালাগান, গাজির গান, হাস্তর গান ইত্যাদিতে গায়েন বসে বসে গাহনাভিনয় করে না। বরং গানের তাড়নায়, ব্যাখ্যা ও অভিব্যক্তির প্রয়োজনে সে দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে, নেচে গাহনাভিনয় করে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যও যেহেতু শাস্ত্রবদ্ধ উচ্চাঙ্গনৃত্যের কঠিন সূত্রে বাঁধা নয়, গানের ভাব প্রকাশের জন্যই যেহেতু মিশ্র নাচের ব্যবহার সেহেতু এই অভিনয়কে সমালোচকের ভাষায় 'গীতাভিনয়' এবং প্রবন্ধকারে অভিধায় 'গাহনাভিনয়' বলা সংগত। এই গাহনাভিনয়ের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর গায়েনদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ পূর্ব বাংলায় জমিদারি করার কারণে কুষ্টিয়া, পাবনা, নওগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে নৌকায় ভ্রমণের সময় এদেশের গ্রামীণ সমাজের নানা ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন বলেও জানা যায় যা সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। 'মালতী পুঁথি', 'বাউলের গান', 'অতিথি' ইত্যাদি রচনাগুলোও প্রমাণ করে যে ঐতিহ্যবাহী নানা লোক পরিবেশনার সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের সুবাদে নিশ্চয়ই তিনি গায়েনদের স্বল্প মঞ্চোপকরণ ও প্রাত্যহিক পোশাকসহ ইঙ্গিতধর্মী (সাজেসটিভ অর্থে) পরিবেশনা দেখেছিলেন। তা ছাড়া জাভা দ্বীপের নৃত্য, জাপানের কাবুকির অতিরঞ্জিত ইঙ্গিতধর্মী শারীরিক অভিনয়ের অভিজ্ঞতাও কবির তন্ময়তায় ছিল বৈকি। বাস্তবধর্মী অভিনয়ের বাইরে গিয়ে গাহনধর্মী ইঙ্গিতময় স্টাইলাইজড অভিনয় যে ভিন্ন রস তৈরি করে সে অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই প্রেরণা যুগিয়েছিল সেই ধরনের কিছুর সৃজন-নিরীক্ষা করতে। তাই বলা যায়, গায়েনদের গাহনাভিনয়, বিশ্বের নানা জনপদের ঐতিহ্যবাহী ইঙ্গিতধর্মী পরিবেশনা (জাভার গেমল্যান, জাপানের কাবুকি কিংবা ইউরোপের অপেরা) ইত্যাদি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য পর্যায়ে যে নৃত্যের প্রয়োগ করেছেন তা আদতে গীতময় গাহনাভিনয়ের ঐতিহ্যের নবায়নসহ পরিবেশনায় বৈশ্বিক প্রতিভঙ্গি অন্বেষণের নিরীক্ষা।

ইঙ্গিতধর্মী অভিনয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধেই বলেছিলেন, "কতেক তুমি বোঝাইবে, কতেক তাহারা বুঝিয়া লইবে"। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যাত্রার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি আসলেই যাত্রার আসরে যে নিরাভরণ মঞ্চ ও ইঙ্গিতধর্মী সাজেসটিভ ধরনের পরিবেশনা হয় তার পক্ষে তদীয় মতামত দেন। ১৯০৮ সালে *শারদোৎসব* রচনা ও প্রযোজনার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে নাট্যবিষয়ক নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। বলা যায় 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছিলেন তা প্রয়োগ করে যেন পরখ করে নিতে চান তিনি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৩৯৮ বঙ্গাব্দ: ১৩৩) বয়ানে দেখি রবীন্দ্রনাথের নিরাভরণ মঞ্চ প্রয়োগের কথা:

> একবার 'শারদোৎসবে' তো ঐ রকম করে স্টেজ সাজানো হল, পিছনে দেওয়া হল নীল বনাতটি, তখন থেকে ঐ নীল বনাতই টানিয়ে দেওয়া হতো স্টেজের ব্যাকগ্রাউণ্ডে। প্রকাণ্ড একটা শোলার ছত্র ছিল বেশ ঝিক্‌ঝিকে আসামের অভ্র দেওয়া। সেইটিই এক পাশে টানিয়ে দেওয়ালুম। বেশ নীল রঙের আকাশের গায়ে ছত্রের রঙটি চমৎকার দেখাতে

> লাগল। রবিকাকার তেমন পছন্দ হলনা; বললেন, রাজছত্র কেন আবার। বেশ পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে স্টেজ থাকবে। বলে সেটিকে খুলে দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষ্য থেকেই বোঝা গেল যে, রবীন্দ্রনাথ তখন নিরাভরণ মঞ্চের দিকে ঝুঁকছেন। পরবর্তীকালে এক *ডাকঘর* ছাড়া বেশিরভাগ নাটকেই এই রকম নিরাভরণ মঞ্চের প্রয়োগ দেখা গেছে রবীন্দ্র নাট্যচর্চায়। সুব্রত ঘোষ (২০১৭: ৬০) *শারদোৎসব* মঞ্চায়নে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের নিরাভরণ মঞ্চের উদ্যোগকে শনাক্ত করেছেন নিম্নরূপে:

> আবার অন্যদিকে, যাত্রা আঙ্গিককে সংশোধিত করে দেশীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণ করার তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) যে নিজস্ব নাট্যচিন্তা, যা ১৯০৮ সালের *শারদোৎসব* থেকে প্রকটিত হতে লাগল, তাও তিনি কোনওদিন পেশাদার মঞ্চের প্রযোজনায় আরোপ করার প্রয়াস পাননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় ও অভিনয়বিষয়ক দৃষ্টান্তমূলক বিশ্লেষণের প্রয়াস পাওয়া যাক। আমরা জানি একেবারে শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বেশিরভাগ নাটকেই অভিনয় করেছেন। অলীকবাবু-বাল্মিকী থেকে শুরু করে রঘুপতি, জয়সিংহ, ঠাকুর্দা, কবি শেখর নানা ভূমিকায় মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। ইন্দিরাদেবী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের স্মৃতিচারণ এবং সমকালীন পত্র-পত্রিকার তথ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় ও অভিনয়চিন্তা সম্পর্কে জানা যায়। ইন্দিরা দেবী *বাল্মিকী প্রতিভায়* রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর সুললিত কণ্ঠ, গাহন ও অভিনয়ের কথা ব্যক্ত করেন (চৌধুরানী, ২০২১: ৪৩)। অন্যত্র তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গায়কী ও সংগীত নিরীক্ষা বিষয়ে বলতে গিয়ে 'নাট্যরস' নামক একটি রসের কথা বলেছেন নিম্নরূপে:

> সিন্ধুর মতো করুণ কোমল রাগকেও কেমন উদ্দীপনা প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন সেটা 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানে লক্ষণীয়। অবশ্য লয় ও গায়কী দ্বারা গায়কেরও সেই ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমার মনে হয় এ-সকল ক্ষেত্রে নাট্যরস নামক নবতর একটি রসের অবতারণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমাদের সংগীতে উদ্দীপনার অভাব রবিকাকা নানারকমে পূরণ করেছেন, তাঁর সংগীতভক্তগণ চেষ্টা করলে আরো এমন দৃষ্টান্ত মনে আনতে পারবেন (চৌধুরানী, ২০২১: ২৫)।

উক্ত মতামতটিতে 'নাট্যরস' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ যা অলঙ্কারশাস্ত্রের নবরস থেকে ভিন্ন। এই রসটির দ্বারা গানের পারফরম্যান্স বা অভিনয়কে বোঝানো হচ্ছে বলে মনে করা সংগত। কেননা আমরা জানি একই গান একই সুর কণ্ঠশিল্পীর গায়কী ও হৃদয়ানুভূতির অভিব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে রস সৃজন করে থাকে। গায়কভেদে অভিব্যক্তির ভিন্নতা যদি রসের ভিন্নতা তৈরি করে তা হলে সেই গাহনমূলক স্বকীয় অভিনয় 'নাট্যরস' নামক নবতর এক রস সৃজন তো করেই। *বাল্মিকী প্রতিভাতে* রামপ্রসাদী গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন সেই নাট্যরস সৃজন করেন তাঁর গাহনাভিনয়ের মধ্য দিয়েই। গান বা গাহন যে এই বিশেষ রস সৃজনের মাধ্যমে এক স্বকীয় নাট্য উদ্ভাস নির্মাণ করতে পারে রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পেরেই হয়তো *বাল্মিকী প্রতিভা*-র একটি প্রদর্শনীতে 'রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবতারা!' গানটি দর্শকদের অনুরোধে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন (ঘোষ, ২০১৭: ১০৯)। এখানেই রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রয়োগে বিশেষ ও স্বকীয় নাট্যরস সৃজিত হয় ভাবলে অসংগত হয় না। এর প্রেরণাতেও ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল ছিল শনাক্ত করা যায়। ইসলামউদ্দিন পালাকারের পালা পরিবেশনায় 'পাগলা গুরারে' গানটি এতই জনপ্রিয় যে প্রদর্শনীভেদে দর্শকদের অনুরোধে সেই গানের পুনরাবৃত্তি প্রবন্ধকার প্রত্যক্ষণ করেছেন একাধিকবার। ফ্লুইডিটির বৈশিষ্ট্যধারী বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী

লোকনাট্যে গায়েনদের এই স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথকেও স্বাধীনতা দিয়েছিল একই গান একই প্রদর্শনীতে একাধিকবার গেয়ে স্বকীয় নাট্য অভিজ্ঞতা নির্মাণে।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে অহীন্দ্র চৌধুরী মতামত প্রকাশ করেন যে, তিনি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী যা একাধারে মঞ্চে তাঁকে সমুজ্জ্বল করেছে (ঘোষ, ২০১৭: ১২৮)। একই গুণকে স্বীকার করে শিশিরকুমার ভাদুড়ী একে দুর্বলতা ভাবছেন এই কারণে যে চরিত্রের মধ্যে থেকেও কখনও কখনও 'রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়তেন' (ঘোষ, ২০১৭: ১২৯)। এ কথাও জানা যায় যে, শান্তি নিকেতনে পাকাপাকিভাবে চলে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্ন্যাসী, ঠাকুর্দা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, কবি শেখর ইত্যাদি যে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন সেগুলো কবির ইমেজ বা ব্যত্তিত্বের সাথে এতটাই সদৃশ ছিল যে মনে হতো তিনি সেখানে যেন বাউল কবি বা বাংলার পালাকার হিসেবেই মঞ্চে নিজের কথাগুলো বলতে এসেছেন। তবে সেই চরিত্রগুলো ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে তদীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ যে স্পষ্ট ছিল তা প্রতিমা দেবী, সীতা দেবী প্রমুখের স্মৃতিচারণেও পাই (ঘোষ, ২০১৭: ১২৬)। এই বিষয়ে গায়েনের চেতনাগত অবস্থান বা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর রস নিষ্পত্তি প্রসঙ্গের অবতারণা করা আবশ্যক। আমরা যখন গ্রামীণ পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলো দেখি তখন সেখানে জানা কাহিনিরই একটি পুনরুদ্‌যাপন ঘটে। কেননা গায়েন সেই সমাজেরই একজন এবং অভ্যাগত দর্শকও তাদের সামষ্টিক বোধ বিশ্বাস নিয়ে বহুকাল ধরে মুখে মুখে প্রচারিত এই কাহিনিগুলোর সাথে পরিচিত (মহুয়া, রূপভান, গুনাইবিবি ইত্যাদি গল্প আমরা ছোটোবেলা থেকেই অগ্রজের কাছ থেকে শুনে থাকি)। উপরন্তু, পরিবেশনায় গায়েনও চরিত্রানুগ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেন না, চরিত্র হয়ে ওঠারও চেষ্টা করেন না। তার ইঙ্গিতধর্মী বর্ণনাত্মক গাহনাভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের কল্পনায় দৃশ্য তৈরি হয়। সেলিম আল দীনের মতে, গায়েন নিজের ব্যক্তিত্বকে জাহির করে (অর্ক ও হাবিব, ২০১৫: ৪), কখনোই ভুলতে দেন না যে তিনি কুদ্দুস বয়াতি, ইসলামউদ্দিন বা জামাল বয়াতি। পরিবেশনা শেষে আমরা গায়েনের রূপকল্প মনে নিয়েই ফিরে আসি। মনে রাখা প্রয়োজন অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্র পর্যন্ত যারা গায়েন তারাই পালাকার বা কবি ছিলেন। তার মানে গায়েন কাহিনি সম্পর্কে তার নির্দিষ্ট একটি চেতনাগত অবস্থান থেকে পরিবেশনাটি করেন যা তার ব্যক্তিত্বকে অক্ষুন্ন রাখে। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে গায়েনের সেই "stand point" কার্যকর ছিল কিনা তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। অহীন্দ্র চৌধুরী অবশ্য কবির এই বিশেষ ধরনের অভিনয়কে 'রস থিওরি' দিয়ে বিচার করেছেন (ঘোষ, ২০১৭: ১২৮-১২৯)। শাহাদৎ রুমন গীতের মাধ্যমে নাট্যরস সৃজনকে 'বিশেষ স্ফূর্তি' হিসেবে বিবেচনা করেছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রেখটের নাট্যচর্চায় gestus বা gestic acting প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি রাখে। আমরা জানি এ ধরনের অভিনয়ে অভিনেতা একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাহিনি, কাহিনি অভ্যন্তরস্থ সংকট ও চরিত্রসমূহকে রূপায়ণ করে। এমনকি ঋণাত্মক চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রেও অভিনেতার সেই চেতনাগত অবস্থান ক্রিয়াশীল থাকে। প্রবন্ধকারের পূর্ববর্তী গবেষণায় এ বিষয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে (অর্ক, ২০১০: ৩৬-৩৭)। 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে উৎপল দত্তের অভিনয়ে বিষয়টি অনুধাবন করলে লক্ষ করা যায় যে, সেখানে অভিনেতা উৎপল দত্ত যেন হীরক রাজ চরিত্রটিকে একটি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করছেন একটি বিদ্রুপাত্মক ঢঙে। এই অভিনয়ে মার্কসিস্ট উৎপল দত্তের ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট দৃশ্যমান যা সচেতন দর্শকমাত্রই লক্ষ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয়ে জীবন, মুক্তি ও মানুষ সম্পর্কে তদীয় সেই বিশেষ চেতনাগত অবস্থান তাঁর ব্যক্তিত্বকে দৃশ্যমান করেছিল বলে অনুমান করা অসংগত নয়।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শান্তি নিকেতন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ঋতুভিত্তিক নাট্য 'বর্ষামঙ্গলের পালা', 'শেষ বর্ষণের পালা' ইত্যাদি প্রযোজনা কিংবা 'নবীন' এর মতো নাট্যমূলক পরিবেশনাগুলো করছিলেন তখন তিনি নিজে মঞ্চের একধারে উপবিষ্ট হয়ে সূত্রধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গানগুলোর বিষয়বস্তু তথা পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ বিষয়ে

স্মৃতিচারণকারীদের বিবরণ ও সমকালীন পত্র-পত্রিকার পর্যালোচনা লভ্য (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: ১৮৪-১৮৭)। এই ব্যাখ্যার মতো কাজটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোতেও লভ্য। মনঃশিক্ষা অংশে বা ভণিতাযুক্ত করে বাংলাদেশের গায়েনগণ মানুষের জীবনের চিরন্তন বহু বিষয় যেমন প্রেম, বিরহ, মুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কৃত্যমূলক নাট্য মনসার গান, পদ্মপুরাণ, গাজির গানে এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রবন্ধাকারের গোচর হয়েছে (বাহাদুর, ১৯৯১; মিয়া, ২০১৪; চন্দ্র, ২০১৯; রায়, ২০২২)। সেলিম আল দীন বলছেন বর্ণনাত্মক নাট্যের দার্শনিক অভিপ্রায় ব্যাখ্যা (দীন, ১৯৯২: কথাপুচ্ছ)। তাঁর ভাষ্য অনুসারে আমাদের গায়েনগণ ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোতে কাহিনির দৃশ্যায়ন নয় ব্যাখ্যাই করেন। তাই যদি হয় তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত পরিবেশনাগুলোতে তাই করছেন। ব্রেখটের নাট্যে এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণটি হয় মার্কসবাদের আলোকে। কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যে তা লোকবিশ্বাস তথা সামষ্টিকের সংস্কারজনিত বোধ-বিশ্বাসের আলোকেই হয়ে থাকে বলে দর্শককে বিযুক্ত করে না। বরং কাহিনির উপস্থাপনের এক পর্যায়ে তা যেন কাহিনি অভ্যন্তরস্থ সংকটের 'বিবর্ধন' করে আরও গভীর দ্যোতনাসহ উপস্থিত সামাজিকগণকে যুক্ত করে। গানসর্বস্ব নৃত্যনাট্য, ঋতুভিত্তিক নাট্য বা নাট্যমূলক উপস্থাপনাগুলোতে রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন বলে প্রতিভাত হয়। বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যে দৃষ্ট গায়েনদের বয়ানে (বয়াতি কথাটি বয়ান থেকেই) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যে প্রবণতা, সেই অভিজ্ঞতাই প্রেরণা জুগিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে সূত্রধর হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট থেকে নাট্যের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রসঙ্গত এবার ব্রেখটের 'এলিয়েনেশন' ধারণাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ব্রেখটের থিয়েটারে এলিয়েনেশনের একটি পন্থা হিসেবে গানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কখনো সে গান চরিত্র নিজেই করে, কখনোবা সূত্রধর বা কোরাস সেই কাজটি করে থাকে। গানগুলোতে সাধারণত কাহিনির সংকট, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রবণতা ইত্যাদি বিধৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানে একই ধরনের ভূমিকা লক্ষ করা গেলেও তাঁদের প্রয়োগ দার্শনিকতায় ভিন্নতা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যে প্রযুক্ত গানগুলোতে ঠাকুর্দা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদা ঠাকুর, মায়াকুমারীগণ, চাঁদ কবি, বিশু পাগল ইত্যাদি চরিত্রগুলো যে প্রকৃতি-বর্ণনা, জীবনতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে তা বরং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী যাত্রার বিবেকের গানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যাত্রার বিবেকও একই কাজ করে থাকে। উল্লেখ্য, যাত্রার বিবেক গাইবার সময় মঞ্চক্রিয়া থেমে যায় যা আপাত অর্থে ব্রেখটের এলিয়েনেশনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হতে পারে। প্রকৃত অর্থে ব্রেখটের নাট্যে গানের যে উদ্দেশ্য তার সাথে বিবেকের গানের সম্পর্ক নেই। জাপানের কাবুকিতে 'মিয়ে' নামক একটি বিশেষ মঞ্চক্রিয়া অভিনেতারা করে থাকেন। কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো তদীয় আবেগের চূড়ান্ত প্রকাশ করেন 'মিয়ে' নামক এই বিশেষ মঞ্চক্রিয়ার দ্বারা। সে সময় মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য অভিনেতারা তাদের অ্যাকশন থামিয়ে দেন। যেন সময়ের প্রবাহমানতাকে থামিয়ে দিয়ে আবেগকে উচ্চকিত করে দেখানো হলো। 'মিয়ে' করবার সময় অভিনেতার যে শারীরিক ভঙ্গি তার প্রেরণা হিসেবে বৌদ্ধবাদের সাথে সম্পর্ককে খুঁজে পান জাপানি গবেষকগণ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যাত্রার বিবেকের গানও কাহিনির সংকটকে দর্শকের কাছে আরও গভীরভাবে সঞ্চারণের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত। সময় এখানেও থামিয়ে দেওয়া হয়, যেমন থামিয়ে দেন আমাদের পালাগানের গায়েন "এই কতা তাউক এইখানে পড়িয়া" বলে। কাজেই শঙ্খ ঘোষ যথার্থই বলেছেন গানের মাধ্যমে তত্ত্বকথা বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথকে ব্রেখটের কাছে প্রেরণা খুঁজতে হয়নি (রায়, ১৯৮৭: ৬৪), আমাদের দেশের যাত্রার বিবেক বা পালাগানের গায়েনদের মধ্যেই এর প্রেরণা ছিল।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা থেকে শুধু গান নয় আরও কিছু বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন বলে লক্ষ করা যায়। যেমন প্রদর্শনী শুরুর আগে ঘণ্টা দেওয়ার যে রীতি ঠাকুরবাড়িতে ছিল (ঠাকুর, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ: ৯০) তা যাত্রা থেকে নেওয়া। যাত্রার আসরে ঘণ্টা দেওয়ার

প্রচলন কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশেই দেখা যেত। রবীন্দ্রনাথের কালে তার বহুল প্রচলন ছিল বলেই হয়তো এই ঘণ্টার ব্যবহার তিনি তদীয় প্রযোজনাগুলোতে যুক্ত করেছিলেন (ঠাকুর, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ: ৯০)। প্রম্পটার ব্যবহারও যাত্রা থেকেই নেওয়া। প্রম্পটার প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরোয়াতে* স্মৃতিচারণ লভ্য (ঠাকুর, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ: ১৩০-১৩১)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও প্রম্পটার হিসেবে কোনো কোনো প্রদর্শনীতে নিয়োজিত হয়েছিলেন বলে জানা যায় (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: ৯৪)। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ প্রযোজনায় চরিত্রানুগ বেশভূষা ব্যবহৃত হলেও কিছু কিছু প্রযোজনায় তার ব্যত্যয় লক্ষ করা গেছে। চরিত্রানুগ পোশাক পরিচ্ছদের পরিবর্তে অভিনেতার পোশাক ব্যবহার লক্ষ করা গেছে রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিনেয় চরিত্র ঠাকুর্দা চরিত্রে। কখনো তিনি গেরুয়া জুব্বা আবার কখনো সাদা পোশাক ব্যবহার করেই অভিনয় করেছেন। অন্যান্য অভিনেতার ক্ষেত্রে কখনো কখনো তিনি চরিত্রানুগত্যের বদলে অভিনেতার মঞ্চে দৃশ্যমানতায় সৌন্দর্যকে বিবেচনা করেছেন বলে মনে করা যায় (ঘোষ, ২০১৭: ৮৯)।

নাটক রচনা ও প্রয়োগে গানের নিরীক্ষা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক সত্তায় নানাধর্মী নিরীক্ষার প্রবণতা লক্ষ করা যায় যা 'রবীন্দ্র নাট্য' নামক একটি স্বকীয় শিল্প সৃজনের স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। 'চিত্রপট' নয় 'চিত্তপট'-ই যে তাঁর অভিপ্সিত লক্ষ ছিল তা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন (ঠাকুর, ১৪০২ বঙ্গাব্দ: ১০২৮-১০২৯)। সে কারণেই ঐতিহ্য অনুগত হয়ে কাহিনির ঘনঘটা নয় বরং হৃদয়াবেগের উদ্‌যাপন দেখি তাঁর নাট্য প্রয়াসে। কবির মন্ময়তায় যে ভাবের উদ্রেক তাকেই যেন 'ডেমোনস্ট্রেশন' করে দিয়ে যান তার গানময় নাট্য প্রচেষ্টাতে। তাতে নাটকীয়তা না থাকলেও একটি স্বকীয় নাট্যভাব তৈরি হয় বলে অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৪: ১৩০) শনাক্ত করেছেন। গানের ব্যবহার, একই গান নানা নাটকে ব্যবহার (চক্রবর্তী, ১৯৯৫: ২৮, ৪৫, ৪৬, ১৯৯) (*তাসের দেশ/অচলায়তন*), এমনকি অন্যের লেখা গানও তাঁর নাটকে যুক্ত হতে দেখেছি যা পূর্বেই উল্লেখ করা গেছে। এগুলো শুধু সংগীতের নিরীক্ষা নয় বরং সংগীতময় স্বকীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াস। এই প্রবণতাগুলোও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য থেকে পাওয়া। আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোতে গায়েনরা প্রচলিত লোকগান ব্যবহার করেন। একই বিয়ের গান, স্নানের গান নানা পালায় জুড়ে দেওয়া প্রবন্ধকার বহু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছে। পুরুষ দ্বারা নারী চরিত্রের অভিনয়ে নাট্যধর্মীতার যে বৈশিষ্ট্য সেই জ্ঞানও রবীন্দ্রনাথকে এমন ঐতিহ্যানুসারী নানা উদ্যোগে ব্রতী করেছিল। নিজেও নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন (ঘোষ, ২০১৭: ১০২), এমনকি নন্দিনী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য একজন পুরুষকে দিয়ে অভিনয়ের কথা ভেবেছিলেন কবি (ঘোষ, ২০১৭: ৮৫)। নাচের ভঙ্গিতে কী করে গানের মর্ম প্রকাশ করতে হয় সেই নিরীক্ষাও করেছিলেন তিনি নৃত্যনাট্য পর্যায়ে এসে, নানা আঙ্গিকের নৃত্যের ফিউশন করে। শান্তিদেব ঘোষ (২০১৬: ৬৪) জানিয়েছেন, এ পর্যায়ে নৃত্যনাট্যে ছন্দের গতি কথার অনুকূলে আনার প্রয়োগ নিরীক্ষায় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ *চণ্ডালিকা* নাটকের মা-মেয়ের কথোপকথন অংশে।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত ছাড়াও গদ্যকে সুরারোপ, ভাব অনুসারে নাচের প্রশিক্ষণ ও ভাবনৃত্যের প্রয়োগ, মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জার অনাড়ম্বরতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নির্দেশক বা নাট্যবেত্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঞ্চে এমন একটি 'নাট্য-কাণ্ড' ঘটাতে চেয়েছেন যা একেবারেই বাংলাদেশ বা বৃহৎ অর্থে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অনুগত কিন্তু একাধারে বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা অনুধাবিত, রাবীন্দ্রিক।

নাটক ও নাট্যকে গানময় করে তোলা, নিরাভরণ মঞ্চের প্রতি আগ্রহ, দর্শক-অভিনেতার পারস্পরিক ব্যবধান দূর করার জন্য নানা প্রয়াস এবং সর্বোপরি নিজস্ব মুক্তির তত্ত্বকে অভিব্যক্ত করতে রবীন্দ্রনাথের যে নিজস্ব প্রয়াস তা সত্যিকার অর্থেই ত্রিমাত্রিক শূন্য স্থানে নাট্যময়তার একটি স্বকীয় উদ্ভাস সঞ্চারণ করে বলে অনুভূত হয়। একালে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের শুধু পাঠ ও জানা সুরের দ্যোতনা অনুভব করলেই অনুধাবন করা যায় যে, গীতময়তা-সুরময়তা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্বকেই

একটি অদ্বৈত অভিব্যক্তির আদলে আসরে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন যাকে নাট্য-কাব্য-গীত-কৃত্যময় বাঙালির পার্বণের সার্বিক উচ্ছ্বাসসহই অনুভব করতে হয়।

উপসংহার

বহুময় পথের পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো পান্থজনের সৃষ্টিকর্মকে বিচার করতে গেলে গবেষণার নৈর্ব্যক্তিকতার শত প্রয়াস সত্ত্বেও সে সৃজনের নানা দিক বিশ্লেষণে বহুময়তার ব্যঞ্জনা এমন শক্তি নিয়ে দাঁড়ায় যে পৃথক করে তাঁর সৃজনের কোনো দিক বিশ্লেষণ করলে তা সম্পূর্ণ বলে মনে হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যচিন্তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাই রচনা ও প্রয়োগ আলাদা করে অনুধাবন করা বেশ সংকটের হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, স্রষ্টার কাছে আগে তত্ত্ব পরে প্রয়োগ বা আগে প্রয়োগ পরে তত্ত্ব এমন ক্রমানুসারে হয়তো সৃষ্টি আসে না। হয়তো একসাথেই আসে, আবার শিল্পীভেদে এর ভিন্নতাও রয়েছে কিনা বলা যায় না। বক্ষ্যমাণ গবেষণার অনুসন্ধান পর্যায়ে লক্ষ করা গেছে যে, রচনা করে তারপর প্রয়োগ করা হয়েছে এমন নয়। পরিবেশনার উদ্দেশ্যেই কখনো কখনো কবি রচনা করেছেন। বাংলাদেশের লোককবিগণ যেমন পরিবেশনার জন্য গান বা পালা বাঁধতেন বা এখনো বাঁধেন তেমন। ইউরোপীয় সংস্কৃতিসহ সারা পৃথিবীর বহু জাতির সংস্কৃতির সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সুযোগ তাঁর পারিবারিক আভিজাত্যের প্রশ্রয় থেকেই পাওয়া। তাই শুরুর দিকে তৎকালীন বাংলায় প্রচলিত ইউরোপীয় আদলের নাটক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা হয়তো শুরু হয়েছিল। কিন্তু একই প্রশ্রয় তাঁকে দেশজ ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতাও দিয়েছিল বৈকি। পিতা, পিতামহসহ সকলের পৃষ্ঠপোষকতায় ঠাকুরবাড়িতে যেহেতু ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা প্রদর্শনের প্রায়-নিয়মিত ব্যবস্থা থাকতো সেহেতু ঐতিহ্যের প্রতি লগ্নতার অভাব রবীন্দ্রনাথের কখনোই হয়নি। তাই শুরুতে বিদেশি নন্দনতত্ত্বের আদর্শ অনুসারী হলেও ক্রমেই তিনি অনুধাবন করেছিলেন নিজ ভূমির অভিব্যক্তির স্বকীয়তা। গীতময়তার ছন্দিল-সুরেলা পালকিতে করে মুক্তির মন্ময় তত্ত্ব বিশ্বের সকল মানুষের কাছে এক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দ্যোতনাসহই যেন পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন কবি। চাওয়ার এই শৈলী ও প্রতিভঙ্গি বাংলাদেশের ঐতিহ্যপ্রসূত। তাই ঘটনার ঘনঘটা দিয়ে নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে নাট্যরস নির্মাণ নয় বরং মুক্তির তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য দেশজ প্রতিভঙ্গির নানা নিরীক্ষা করেছেন তিনি তাঁর নাটক ও নাট্যে। যেন তিনি দেশি মাটির গন্ধমাদনটুকু অন্তরে নিয়ে লোকরুচির অনুগত অথচ বৈশ্বিক উচ্চতায় গিয়ে এমন এক নাট্য নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যার শেকড় মাটিতে শক্ত করে প্রথিত হলেও মুখ তার আকাশমুখী। প্রাচীন অশ্বত্থের মতো সেই নাট্য- শরীরের কাণ্ডটা সুঠাম যা থেকে ডালপালা এতদূর তার বিস্তার করতে উন্মুখ যেন ডানা মেলে সে উড়ে যাবে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তরে, তার শরীরে মাখা সোঁদা মাটির ঘ্রাণ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়েই।

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

অর্ক, ইউসুফ হাসান (২০২১), *গাহনাভিনয়*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

..., ... (২০১৮), *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য পালাগান: আঙ্গিক বিচার ও বর্ণনাকারীর অবস্থান অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

..., ... (২০১০), 'বর্ণনাত্মক বাঙলা নাট্যাভিনয়রীতিতে বর্ণনাকারী অভিনেতার চেতনাগত অবস্থান ও ব্রেখটীয় অভিনয়রীতি পর্যবেক্ষণ', *থিয়েটার স্টাডিজ, সপ্তদশ* সংখ্যা, জুন ২০১০, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, সাভার, ঢাকা।

..., ... এবং হাবিব, মোহাম্মদ আশরাফুল (২০১৫), 'বর্ণনাত্মক বাঙলা নাট্যে অভিনয় ও রস নিষ্পত্তির সূত্র অন্বেষণ: গায়েনরীতির অভিনয় বিষয়ে সেলিম আল দীন ও কুদ্দুস বয়াতির সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ', *থিয়েটার স্টাডিজ*, সংখ্যা ২২, জুন ২০১৫, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, সাভার, ঢাকা।

আহমেদ, সাজু (১২ মে ২০১৯), 'শিল্পকলায় যাত্রা উৎসব ও বিবেকের গান', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা।

ঘোষ, শঙ্খ (২০১৫), 'নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', *নির্বাচিত প্রবন্ধ: রবীন্দ্রনাথ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

..., ...(১৯৬৯), *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক*, দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।

ঘোষ, শান্তিদেব (২০১৬), *নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ঘোষ, সুব্রত (২০১৭), *রবিনাটকের নাট্যকথা*, আনন্দ পাবলিশার্স (সিগনেট প্রেস), কলকাতা।

চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ (১৯৯৫), *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ: সমকালীন প্রতিক্রিয়া*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী (২০২১), *রবীন্দ্র স্মৃতি-সংগ্রহ*, সুপ্রিয় ঠাকুর সম্পাদিত, কিংবদন্তী, কলকাতা।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৯৮ বঙ্গাব্দ), 'শ্রীরানী চন্দ', *ঘরোয়া*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০৬ বঙ্গাব্দ), *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

..., ... (১৪০২ বঙ্গাব্দ), "বাল্মিকী প্রতিভা", "জীবনস্মৃতি", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

..., ... (১৪২১ বঙ্গাব্দ), *সংগীত চিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

দীন, সেলিম আল (১৯৯৬), *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

..., ... (১৯৯২), *হরগজ*, গ্রন্থিক, ঢাকা।

রায়, কুমার (১৯৮৭), *নাট্যভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রতিভাস, কলকাতা।

রুমন, শাহাদৎ (২০২২), *ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের বিনির্মাণ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সেলিম আল দীনের স্বকীয়তা অনুসন্ধান*, পেন্সিল পাবলিকেশনস, ঢাকা।

শেখর, সৌমিত্র (২০১৪), 'লোকসংস্কৃতির উপাদান: রবীন্দ্র নাটক', *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি*, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

সিকদার, অশ্রুকুমার (২০১৪), *গদ্যসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

ওয়েবসাইট

https://roar.media/bangla/main/art-culture/tagoresforeingmusic, viewed 20 june 2022.

ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য-পরিবেশনা :

চন্দ্র, সুবল (২০১৯), *মনসার গান*, রাজশাহী।

বাহাদুর গায়েন (১৯৯১), নগরকান্দা, ফরিদপুর।

মিয়া, চান (২০১৪ এবং ২০১৯), *গাজির গান*, গোলাইডাঙ্গা, মানিকগঞ্জ।

রায়, শ্রী পল্লব কুমার (২০২২), পদ্মার নাচন, লালমনিরহাট।

সাইদুর, মোহাম্মদ (২০১৭), *কিস্সা 'সুতার ময়ূর'*, নওগাঁ।